
নির্বাচিত
নেপালী
ছোট
গল্প
হরেন ঘোষ

নির্বাচিত নেপালী ছোটগল্প

ঃ অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ

হরেন ঘোষ

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৫৭-সি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর ১৯৮৭

প্রকাশক :
সি. ভট্টাচার্য
ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিমিটেড
৫৭ সি কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য
পূর্বাশা প্রিণ্টার্স
২২৪/এইচ/১২ মানিকতলা মেন রোড
কলিকাতা-৭০০০৫৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
ইন্দ্রনীল ঘোষ

মূল্য : ১২.০০

নেপালী ছোটগল্প সম্বন্ধে বাঙ্গালী পাঠকদের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। ভারতীয় নেপালীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে দার্জিলিং জেলায় সাহিত্য চর্চা হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হতে। এখানে কয়েকজন প্রবীন ও নবীণ কথা-শিল্পীর গল্পের অনুবাদ সঙ্কলিত করা হল। মূল নেপালী হতে এগুলি অনুবাদ করা হয়েছে। সবকটি গল্পই বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত।

—হরেন ঘোষ

এই লেখকের ঃ—

উপন্যাস

জলাপাহাড় (২য় সংস্করণ)
জলপ্রপাত
শিখরস্বপ্ন
তৃষ্ণা
গায়িকার মন
গোধূলিবাসর
কালের পুতুল
রঙের আকাশ
ছায়ার পাখি
ইন্দ্রধনুর রঙ
খেলাঘর

ছোটগল্প

মনের আকাশ
পায়রা চরিত

শিশু কিশোর সাহিত্য

হিমালয়ে ঘুমের দেশে
নাজেহাল যাতুকর

প্রবন্ধ ও অন্যান্য

নেপালী ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি
গুরু নানক, সংক্ষিপ্ত জীবনী
শিখ ধর্ম ও জীবন

রম্য রচনা

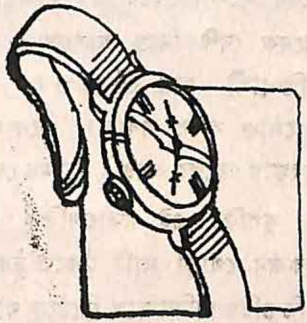
নীল পাহাড় সবুজ মন

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

রিঠের প্রশ্ন

—দেবকুমারী থাপা

সেই গলির কোন নাম ছিল না। নামহীন সেই গলিতে বাস করত এমন লোকেরা যারা অন্য কোথাও থাকতে পারে না। এই বৈজ্ঞানিক যুগেও মানুষ কত কষ্ট করে বসবাস করে। ভিক্ষে করে খায়, সন্তানের জন্ম দেয়। একটু চলতে শুরু করলেই সেই সব শিশুরা পথে পথে ছুটে হাত পাতে। শুধু বাঁচার জন্যে। ওদের কোন চিন্তা-ভাবনার ক্ষমতা আছে কিনা সঠিক বলা যায় না। তবে আধুনিক জীবনের জটিলতা হতে ওরা মুক্ত। ওদের জীবনযাপন প্রকৃতির অনেক কাছাকাছি। মাটির কাছের মানুষ ওরা। ওদের যা ইচ্ছে হয় তাই করে।



কোন কোন সময় কোন ধনী ব্যক্তির শ্রাদ্ধে ওদের খাবার-দাবার জামাকাপড় দেওয়া হয়। এই সব দিনগুলি ওদের কাছে উৎসবের মত।

রেল ষ্টেশনের রাস্তার নিচে খানাখন্দ ভরা অন্ধগলিতে ওদের বাসস্থান। পুরোন টিনের টুকরো চটের জোড়াতালি দিয়ে তৈরি ঝুপড়ি। লাল মাটি দিয়ে লেপে দেওয়া মেঝে। এখানে ওখানে সিনেমার পোষ্টার টাঙ্গানো। ভাঙ্গা পুরোন মাটির গামলায় নানা রঙের ফুল ফুটে রয়েছে। কারো কারো ঝুপড়ির বাইরে সোনাঝুরি ফুলের ঝালর। ঘর সাজাতে ওরা দক্ষ, যত দরিদ্রই হোক না কেন। ওদেরও রুচি আছে। মাঝে মাঝেই ওই ঝুপড়িতে মারদাঙ্গা হয়। এক সঙ্গে বাড়ির বৌ ছেলেমেয়ে চিৎকার করে কান্নাকাটি করে। আবার কখনো সেখান থেকে গানও শোনা যায়। কর্কশ স্বরে মনের আনন্দে গান গায় কেউ। গায়কের তাল লয়ের জ্ঞান হয়ত নেই কিন্তু মনের ভাব রয়েছে।

পৌষ-মাঘে এই ঝুপড়ির দরজা জানালা সব বন্ধ থাকে। ফুটোফাটায়

শুকনো ঝাউপাতা গুঁজে দেওয়া হয়। ঘাস পাতা আর কাঠের আগুনের ধোঁয়া শীতের কুয়াশার সঙ্গে মিশে আকাশে উঠে যায়। সেই সময় ঘরের ভিতরের টাঙ্গান পোস্টার সোনাঝুরির গাছ, চটের পর্দা সব একই রকম দেখায়। ধোঁয়ার রঙের মত।

এই গলিতেই রিঠের জীবন। তার চোখ দুটিও রিঠের বীচের মত গোলগাল বড় বড়। এই ধরনের যাদের চোখ, তাদের রঙ কালো হয়ে থাকে। কিন্তু কেন কে জানে রিঠের গায়ের রঙ ছিল ফর্সা। বারো বছর বয়েস হলে কি হবে ওর হাঁকডাক বাইশ বছরের মত। ভিক্ষে করে সে অনেক বেশী নিয়ে আসতো। জানেও সে অনেক বেশী। তাড়াতাড়ি শক্তিশালী হয়ে উঠছে ও। সকলেই ওকে এটা ওটা করতে বলে। ভালোও বাসে সবাই। ওকে ভয়ও পায় সকলে। রিঠের মায়ের দারুণ অহঙ্কার ছেলের জন্যে। যেমন দেশরত্নদের মায়েদের থাকে তেমনি।

ঝুপড়ির এই গতানুগতিক জীবনে একদিন অকস্মাৎ বজ্রপাত হল। একজন খোঁড়া লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এসে রিঠের মাকে বলল—দোকান থেকে ঘড়ি চুরির অভিযোগে রিঠেকে থানায় নিয়ে গেছে।

রিঠের মা ও অন্যরা ছুটে থানায় এলো। ঠিকই তো ; ও হাজতে রয়েছে। হারানো ঘড়ি ওর পকেটেই পাওয়া গিয়েছে। ও নিজেও স্বীকার করেছে এই ঘড়ি ও চুরি করেছে। তবে যেহেতু ওর বয়স কম তাই পুলিশ দু চার ঘা মেরে ওকে ছেড়ে দিল।

ঝুপড়িতে ঢুকেই রিঠের মা ওর চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে চড় মারতে মারতে বলল—ঘেন্না, ঘেন্না, ছিঃ, এর চেয়ে তোর মরে যাওয়াই ভালো ছিল। তুই কিনা ওই মদিশের ঘড়ি চুরি করতে গেলি ? তোর লজ্জা লাগলো না ? আমি তোকে খেতে দিইনে ? পরতে দিই না ?

অন্যরা এসে রিঠের মাকে বোঝাতে থাকে। কিন্তু পুত্রগর্বে গর্বিত মায়ের আত্মগ্লানি কে বুঝতে পারে ? এত মার খেয়েও একটু কাঁদল না রিঠে। গোল গোল দুটো চোখ দিয়ে একদৃষ্টে মাকে দেখতে থাকলো।

এবার চিৎকার করে কেঁদে উঠল রিঠের মা। রিঠেকে মারা প্রতিটি আঘাত দ্বিগুণ হয়ে ওর বুকে বাজছিল। তার নিজের শরীর যেন জর্জরিত। রিঠের জলহীন শুকনো চোখ যেন ওকে প্রশ্ন করে চলেছে—মা, কেন তুমি এই

খোঁয়াড়ে আমার জন্ম দিয়েছ ? আমারো তো হাতে ঘড়ি পরার সাধ হতে পারে। পোষ্টারে ছবি ছাপাবার ইচ্ছে হয়।

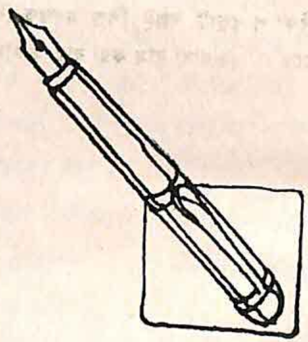
ঐ রাত্রে মা ও ছেলে দু জনেই ঘুমুতে পারেনি।

[দেবকুমারী থাপা। প্রথম জীবনে কার্শিয়াং-এ বসবাস করতেন। তখনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। কার্শিয়াং ও দার্জিলিঙের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছোটগল্প লিখতেন। বর্তমানে নেপালের বিরাটনগরে বসবাস করেন। ১৯৪৯ সাল হতে সাহিত্য চর্চা করছেন। তাঁর অধিকাংশ ছোট গল্পই শিশু মনস্তত্ব-ভিত্তিক। অনেকগুলি ছোটগল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে নাম করা যায় একাদশী, সেতো বিড়ালো, তপারি প্রভৃতি।]

অবশেষে

—ধনহাঙ্গ সুব্বা

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। চারিদিকের ব্যারাকে আলো জ্বলছে। মাঝের ঘরে আমি, নরেন্দ্র ও তার স্ত্রী। নরেন্দ্র আমার সৈনিক জীবনের বন্ধু। তার ব্যক্তিগত জীবনের কোন কথা আমার জানা নেই। এ টুকু জানি যে ওর স্ত্রী সৈনিকের মেয়ে এবং সেনানিবাসেই বিয়ে থা হয়েছে। এছাড়া ওর সম্পর্কে আমার অন্য কিছু জানা নেই। কোনদিন খোঁজ খবর রাখারও প্রয়োজন হয়নি।



নরেন্দ্রের স্ত্রী খুবই সরল স্বভাবের। তার মন জলের মত পরিষ্কার। খুব সরল ভাবেই আমায় অনুরোধ করে—একটা গল্প শোনাও না।

যেদিনই আমি ওদের বাড়ি যাই একটা গল্প আমাকে বলতেই হয়। এদিন আমি বললাম, বাড়িতে মা বাবাকে চিঠি লিখতে হবে। এই কথা বলে নিষ্কৃতি পেতে চাইলাম। ও অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ে বলল—ছিঃ একেবারে বাচ্চাদের মত কথাবার্তা। কাল-পরশু লিখলেও তো হবে। তুমি যদি বাচ্চা ছেলে হতে, তাহলে এই কথা মানাতো। এত বয়স্ক একজন ছেলে মা-বাবার জন্যে এতো চিন্তা ?

আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম—বৌদি আপনি জানেন না, মা-বাবার মন কেমন হয়। মনে পড়ে গেল এবার বাড়ি থেকে এখানে আসবার সময় এই রকমই একটা গল্প শুনেছিলাম।

—তাই নাকি ? বল, বল, অধৈর্য হয়ে উঠল নরেন্দ্রের স্ত্রী।

অগত্যা, গল্প শুরু করতে হল।

তিহার উৎসবের শেষেই আমার কর্মস্থলে ফেরার কথা। সারাদিন কুয়াশা, শীতে হাত পা কুঁকড়ে ছিল। ঘরে বসে আমি চিঠি লিখছিলাম। টেবিলের ওপর খাম, টিকিট ও কাগজপত্র ছড়ানো রয়েছে। বিছানার ওপর স্যুটকেস সে

জামাকাপড় গোছাতে গোছাতে এলোমেলো হয়ে পড়েছে। আমি তখন আমার চারিদিকের বন্ধু-বান্ধবদের চিঠি লেখায় ব্যস্ত। এই সময় আমার ছোট ভাইঝি এসে বলল—একজন বুড়ো মানুষ তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

—কে, চিনিস নাকি ?

—কি জানি, আগে দেখেছি বলে মনে হল না। এটুকু বলেই সে বেরিয়ে গেল।

—আমিই এসেছি বাছা তোমার সঙ্গে দেখা করতে। সেই কবে থেকে আসব ভাবছি, মালয়ের মানুষের সঙ্গে দেখা করব। আজ সেই সুযোগ এলো। এতক্ষণ তিনি দোরগোড়ায় বসেছিলেন। কাছের চেয়ার সরিয়ে বললাম—এখানে বসুন। তিনি শুনলেন না। —তুমি নিশ্চয় জরুরী কাজে ব্যস্ত ছিলে। আমি বাধা দিলাম।

—না, না, কিসের ব্যস্ত। নিশ্চয় আপনিও কোন জরুরী কাজে এসেছেন। আমি সহজভাবেই বললাম।

বৃদ্ধ হয়ত মনে মনে চিন্তা করছেন কি বলবেন। আমি তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। গাল কুঁচকে গিয়েছে, চোখ গর্তে ঢোকানো, হাত-পা ঠাণ্ডায় থরথর কাঁপছে। পায়ে বর্ষাতির জুতো। এবার বললেন উনি—বাছা, সিঙ্গাপুর ও মালয়ের দূরত্ব কত ?

—খুবই কাছাকাছি। সিঙ্গাপুর ও মালয়ের মধ্যে একটা সেতু দিয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে। আমরা এদিক ওদিক যাতায়াত করে থাকি। ওখানে কি আপনার কেউ থাকে ? আমি উল্টে প্রশ্ন করলাম। পূর্ব, পশ্চিম নেপাল ও ভারতের নেপালীরা মালয় ও সিঙ্গাপুরের সেনা বিভাগে কাজ করে। ভাবলাম, অজস্র রবার গাছে ঘেরা ঐ অঞ্চলে এই বৃদ্ধের কোন আত্মীয় স্বজন কাজ করে।

—কি আর বলব বাছা! কে আছে আর কে নেই। দেখলাম, বৃদ্ধের চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু চিক্ চিক্ করছে। কোটের ওপরের পকেট থেকে একটা পুরোনো খাম বার করে এগিয়ে দিলেন। জল ও ধোঁয়ায় অক্ষর প্রায় মুছে গিয়েছে। পড়াই যায় না। ডাক-টিকিটের ওপর সীল রয়েছে জোহর-বাহরু। নাম বা ঠিকানা পড়তে পারলাম না। জোহর-বাহরু উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে নামটা বললে, ওটাই।

—জোহর-বাহরু ও সিঙ্গাপুর খুব কাছাকাছি। আমরা যাতায়াত করে

থাকি প্রায়ই। তাকে আশ্বাস দিলাম। —কোন কথা যদি কাউকে বলার থাকে বলুন।

—একটা ছেলে ছিল। দশ বছর হল মালয়ে গিয়েছে। তার প্রথম চিঠি এটি। কিন্তু এখন আমি জানি না, সে বেঁচে আছে না মারা গেছে। তার খবরাখবর, চিঠি পত্র কিছুই নেই। বাছা যদি নরবাহাদুরের দেখা পাও, চিঠি বা টাকা পয়সা যদি নাও পাঠায়, আমায় যেন একবার এসে দেখে যায়, এই টুকুই বোলো। আমি তার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। তাকে স্কুলে পড়াবার জন্যে কত কষ্ট সহ্য করেছি। কিন্তু এখনো আমার কাঁধে সেই ঝাঁকার বোঝা বইতে হচ্ছে। নরবাহাদুরের লেখাপড়ার জন্যে আমি কি করেছি আর কি করি নি। সেই সময় দার্জিলিঙ শহরে চা-বাগান ও বস্তি হতে পড়তে আসা ছেলে আঙ্গুলে গোনা যেত। তখনকার দিনের নামকরা স্কুল ছিল, দার্জিলিঙ হাই স্কুল। বড় লোকের ছেলেরা, বাঙ্গালী বাবুদের ছেলেরা সেখানে পড়ত। আমাদের মত গরীব-গুরোবের ছেলেদের জায়গা তো দূরের কথা, নাম পর্যন্ত করা যেত না। সেই যুগেও আমি নরবাহাদুরকে হাই স্কুলে পড়িয়েছি।

চা-বাগানে আমার কাজ ছিল চৌকিদারের। তখনকার দিনের মালিকের কাছে টু শব্দ করা যেত না। সারাদিন ধরে তোলা চা-পাতা সন্ধ্যায় হারিকেন জ্বেলে ওজন করা হত। সারারাত কল চলত। আজকের মত তখনকার দিনে বাগান পর্যন্ত বিদ্যুতের আলো পৌছয়নি। ঐ সময়ের কড়া শাসনের মাঝেও আমি নরবাহাদুরকে নিরক্ষর রাখিনি। আর আজ তার প্রতিদান এই ভাবে ভোগ করছি। বাড়ি থেকে ও গিয়েছে তা দশ বছর হবে।

আমি একাই চা-বাগানে দিন কাটাচ্ছি। এই বুড়ো বয়সে যাবই বা কোথায়। ও ছোট থাকতে ওর মা মারা যায়। দ্বিতীয়বার বিয়ে করিনি। নরবাহাদুর যেন সৎ মায়ের অবহেলা না পায়! সে জন্যেই বিয়ে করিনি। না হলে এই বুড়ো বয়সে কথা বলার মত একজন সঙ্গীও তো পেতাম।

এবার প্রসঙ্গ বদল করে বৃদ্ধ আবার জিজ্ঞেস করেন—মালয়ে কবে ফিরে যাবে তুমি ?

—কাল সন্ধ্যার ট্রেনে। সংক্ষেপে উত্তর দিলাম আমি।

—আমার ছেলের সঙ্গে দেখা হলে বোলো, তোমার বাবা শুধু একবার তোমায় দেখার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

বৃদ্ধের ঠোঁট কাঁপছে, চোখে জল। হাতের ওপর চামড়ার ঢাকনি মাত্র, গালদুটো শীতে কুঁকড়ে রয়েছে। বৃদ্ধ এবার পকেট থেকে একটি পেন বার করে কাতর কণ্ঠে বললেন—যে কোন ভাবে এই পেনটা আমার ছেলেকে দিয়ে দিও। তার স্কুলে পড়ার সময়কার স্মৃতি আমার কাছে এতদিন ধরে রয়েছে। এই কলম দিয়েই যেন ও এবার আমায় ওর কুশল খবর জানায়।

নির্জীব এই কলম, আমার ও বৃদ্ধের মাঝে যেন সেতু বন্ধন করতে চায়। নেব কি নেব না, এমন একটা দ্বিধা মনে। কিন্তু পিতৃস্নেহের দৌর্বল্য আমার সব দ্বিধা দূর করে দিল।

—হ্যাঁ, আমি যে কোনভাবে খুঁজে আপনার ছেলের হাতে এই কলম পৌছে দেব; এবং আপনাকে যাতে চিঠি দেয়, অনুরোধ করব। বৃদ্ধকে আমি আশ্বাস দিলাম। কিন্তু আমার এই আশ্বাস কতদূর কি পূর্ণ করতে পারব, আমি নিজেই জানি না।

বৃদ্ধ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। পেছন থেকে আমি দেখলাম দেহে পুরনো একটি কোট, পুরোনো খাকির একটি ঢলঢলে প্যানট, পায়ে বর্ষাতির জুতো। হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছে।

এই বিশাল সেনানিবাসে সেই বৃদ্ধের ছেলেকে আমি কোথায় খুঁজে পাব? কিন্তু বৃদ্ধকে আমি কথা দিয়েছি—এই বলে, কলমটা বার করে দেখিয়ে বললাম—বৃদ্ধের মৃত্যুর আগে যেন এই কলম দিয়ে লেখা তার ছেলের একটি চিঠি দেয়—তাহলেই শান্তিতে মরতে পারবে। আমি কথা দিয়েছি যে ভাবেই হোক এটা করব।

ওপরের গল্পটি শেষ করতেই গার্ড রুমের ভিতর হতে দশটা বাজার ঘণ্টা শোনা গেল। আমি নরেন্দ্রর স্ত্রীকে নমস্কার করে বিদায় চাইলাম। ওদিকে রাতের সেনট্রিরা এদিকে ওদিকের আলো নিভিয়ে দিচ্ছিল।

এতক্ষণ ধরে আরাম কেদারায় শুয়ে একমনে একটির পর একটি সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে নরেন্দ্র। মনে হচ্ছে ও যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। ওর এই রাজপ্রাসাদের মত বাড়ি, চারিদিকে সাজানো নানা আসবাবপত্র, মনে হয় ওকে খুশি করতে পারেনি।

আমি উঠে পড়লাম বিদায় জানিয়ে। আরাম কেদারা থেকে উঠে

এ্যাসট্রেতে সিগারেট ঘসে নিবিয়ে বলল নরেন্দ্র—যাই, ভাইকে ব্যারাক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।

পথ দিয়ে আমরা পাশাপাশি চলেছি, আমাদের মধ্যে একটিও কথাবার্তা নেই। ব্যারাকের মূল গেট এসে গেল।

—এবার আমি যেতে পারব, বললাম।

অকস্মাৎ আমার হাত চেপে ধরে কাতর উৎকণ্ঠিত গলায় বলল নরেন্দ্র—ভাই, ওই পেনটা আমায় দাও।

[ধনহাঙ্গ সুব্বা : দার্জিলিঙের একজন প্রবীণ কথাশিল্পী। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এঁর রচনা প্রকাশিত হয়। তাঁর গল্পগ্রন্থ "হসিমা" জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

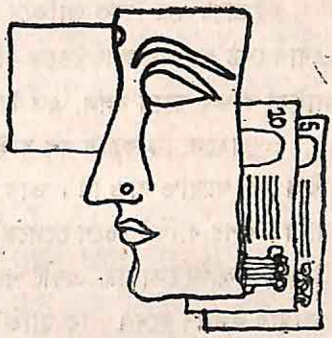
চব্বিশ বছর তিনি ব্রিটিশ সেনাবিভাগে কাজ করে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, বোর্নিয়ো, সারাওক, ব্রুনই, হংকং, ম্যাকাও ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন।

তিনি তাঁর সেনাবিভাগে কর্মরত অবস্থায়ও নিয়মিতভাবে সাহিত্যচর্চা করেছেন।]

ঋণ-শোধ

—দাওয়া

—এই যে সাইলা, কাঠ কাটছ বুঝি ? এই প্রশ্নে নয়, গলার শব্দে সাইলা রাই চমকে উঠল এবং এবার পিছন ফিরে নিজের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা গণেশ মোদিকে দেখল।



—হ্যাঁ, তা কোন কাজ আছে নাকি ? তার কণ্ঠস্বরে ভয় ও উৎকণ্ঠা।

—তা কাজ ছাড়া কেনই বা আসব। শেঠ বলায় এলাম আর কি ! গণেশ জবাব দিল।

—আচ্ছা, আর দিন দুই অপেক্ষা করতে বলুন। যে কোন জায়গা থেকে খোঁজ করেও আমি শোধ দেব। সাইলা আশার বাণী শোনাল।

—ঠিক আছে, আমি তাহলে যাই। শেঠকে এই কথাই বলব। এই কথা বলে সে চলে গেল।

*　　　*　　　*　　　*

তিনদিন পরে শেঠ নিজেই এসে হাজির। তাকে দেখে হতচকিত সাইলা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

—কেমন আছিস সাইলা ? প্রশ্ন করে শেঠ।

কোন জবাব দিল না সাইলা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

—কি ব্যাপার সাইলা, তুই চুরি করিস নি, লুঠ করিস নি, তাহলে আমায় এত ভয় কিসের ? শেঠের হাসির মধ্যে রহস্যময় উপেক্ষার ভাব।

—আমার কত বাকি বলুন ! এতক্ষণে কথা বলতে পারল সাইলা।

—কত আর হবে। গত বছর পুজোর সময় নেওয়া পঞ্চাশ টাকা আর এদিক ওদিক চাল-ডাল-নুন, তেল বাবদ চার কুড়ি আট টাকা পনের পয়সা হবে।

এই কথা শুনে সাইলা অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল।

এমন সময় ঘাসের বোঝা নিয়ে চম্পা এসে পৌঁছল। শেঠের সঙ্গে চোখাচোখি হতে চম্পা মুখ নামিয়ে নিল। তার আরক্তিম গাল দুটির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল শেঠ। তার মৃগনয়ন সরু কোমর কালো শাড়ির অন্তরালে গোলাপী শরীর। শেঠ একমনে ভেবে চলেছে। এবার লেনদেনের প্রশ্ন বাদ দিয়ে শেঠ প্রসঙ্গ বদলাল।

এইভাবে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে চম্পা একছুটে ঘরে ঢুকে গেল। এবার শেঠ কল্পনার জগৎ ছেড়ে বাস্তবে ফিরে এলো। আবার লেনদেনের কথা। সাইলা কাতর ভাবে বলল, এত টাকা সে চট্ করে শোধ করতে পারবে না।

—তাহলে, কি করবে বল সাইলা। বারবার বলেছ সব শোধ করে দেব কিন্তু এক পয়সাও দাও নি। তার ওপর তোমার কোন নির্দিষ্ট কাজ কর্মও নেই। বাকির ওপর বাকিই চেপে চলেছে। এবার তার কণ্ঠে রীতিমত ক্রোধ ফুটে উঠল।—আমি তোমায় একটি পরামর্শ দিতে পারি। তা যদি মানো তাহলে তোমার কল্যাণ হবে। কি রাজি হবে তো?

—কি পরামর্শ হুজুর? আপনার কথা যদি না মানি, তাহলে কার কথা শুনব? দুহাত জোড় করে বলল সাইলা।

—আমার কথা হচ্ছে, তুমি যদি রাজি থাকো, তোমার মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। জলটল ভরে দেবে। আমি খাওয়া পরা ছাড়া মাসে ত্রিশ টাকা দেব। তাছাড়া মাসে মাসে তোমার দশ টাকা বাদ যাবে।

এই প্রস্তাবে সাইলা রাজি হয়ে গেল। সে এর মধ্যে খারাপ কিছু দেখতে পেল না।

পরদিন থেকে চম্পা শেঠের বাড়ি কাজ করতে গেল। ও যেদিন থেকে ওখানে কাজ শুরু করে, সেদিন থেকেই সমাজের রক্তচক্ষু নির্দোষ সাইলার ওপর পড়ল। চম্পার যৌবনের সঙ্গে বৃদ্ধ শেঠের যোগসূত্র স্থাপন করে নানা কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল।

* * * *

রাত আটটা বেজে গিয়েছে। শেঠ হিসাব নিকাশ মেলাতে ব্যস্ত। চম্পা এঁটো বাসন ধুচ্ছে। অন্য সব চাকর-বাকরদের আগেই ছুটি দিয়ে দিয়েছে শেঠ। শুধু দু'তিনটি বাড়তি কাজ দিয়ে চম্পাকে আটকে রেখেছে।

কাজ শেষ হলে শেঠের কাছে এসে চম্পা বলল—হুজুর, কাজ শেষ হয়েছে।

এবার যেতে পারি কি ? তার কোকিল কণ্ঠ শুনে পুলকিত শেঠ তাকে নতুন কাজের হুকুম দিল। —যা একগ্লাস দুধ গরম করে এনে রাখ। তারপর যাস। চম্পা দুধ নিয়ে এলো। শেঠ ওর হাত ধরে টান দিল। ও শেঠের কোলের ওপর এসে পড়ল। এবার শেঠ নিজের স্বার্থ পূর্ণ করার জন্যে ওকে সবলে চেপে ধরল। ও কিছু বলতে পারল না। বাইরে চাঁদের আলো, কিন্তু শেঠের ঘর অন্ধকার। এই ঘটনা কেউ জানতে পারল না।

ক্রমশঃ চম্পার শরীর ভাঙতে থাকে। কিন্তু ঘটনা তেমন কেউ জানে না। যেন এক প্রকাণ্ড স্রোতের ঘূর্ণাবর্তে প্রতি মুহূর্তে ও পাক খেতে থাকে। তারপর একদিন সকলে জানলো, চম্পা পাহাড়ের ওপর থেকে ঝর্ণায় লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

আজ চম্পার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হল। সমস্ত খরচের ভার, কাজের দায় দায়িত্ব শেঠ নিজের হাতে নিয়েছে। চম্পার স্মৃতি রক্ষার জন্যে পথের মোড়ে একটি হাওয়া ঘর তৈরী করে দিল। যাতায়াতের পথে ক্লান্ত পথিকরা বিশ্রাম নিতে পারবে। শেঠের এই সহৃদয়তা ও দানশীলতা দেখে সকলেই প্রশংসা করল। সাইলাকে শেঠ বলল—তোর সব ঋণ মাফ করে দিলাম। বিগলিত সাইলা কন্যার মৃত্যুর কথা ভুলে হাসল—হ্যাঁ, হুজুরের বড় দয়া।

সকলেই শেঠের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগল।

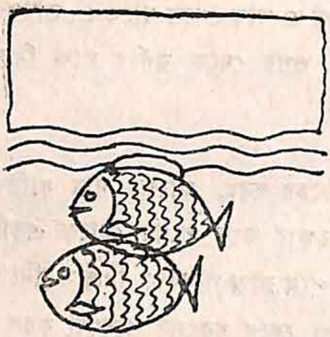
[দাওয়া দার্জিলিঙের এক প্রবীণ কথাশিল্পী। তাঁর গল্প সংগ্রহ "চুনৌতি"তে সাতটি গল্প রয়েছে। এটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাঁর প্রায় সব ছোট গল্পই প্রণয় ভিত্তিক। তবে ছোটগল্পে তিনি শুধুই ইঙ্গিত দিয়ে যান ; বলার চেয়ে না বলা কথাই থাকে বেশি।]

মাছের দাম

—শিবকুমার রাই

[এক]

একটানা বৃষ্টির পর কিছুক্ষণের বিরতি মাত্র। দক্ষিণের বাতাসের ধাক্কায় কালো মেঘের রাশি ছিন্নভিন্ন হয়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে নীল আকাশের ইসারা। কিছুক্ষণ আগে উন্মত্ত হলেও প্রকৃতি এখন শান্ত। মাঝে মাঝে শুধু বজ্রপাত হচ্ছে। পাহাড়ি ঝর্ণার শব্দ, পাথরে পাথরে ঘা খেয়ে প্রতিধ্বনি হচ্ছে।



রণে মাঝি মাথা আকাশে তুলে ডান হাত কপালে রাখল। এক পলক দেখল পাশের ঝর্ণাধারা। ছোট খাট কালো চেহারা, পরনে পুরোন কালো জিনের দোরা স্রুয়াল, দশ জায়গায় তালি মারা। কালো ডোরাকাটা ওয়েস্ট কোটে সাদা বোতামের সারি। মাথায় রঙচটা পুরোন টুপি। রণেকে এক অদ্ভুত জোকারের মত দেখায়।

ঝর্ণার দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখল রণে। তারপরই তার ছোট জালটা নিয়ে ঝর্ণা বেয়ে নামতে থাকল। শ্যাওলাভরা বড় পাথরে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখতে থাকল রণে। ছোটখাট মানুষ রণে, লাফাতে লাফাতে নিচের দিকে নামতে থাকে। অনেক নিচে জল জমে একটা বিরাট দহ সৃষ্টি হয়েছে। সাদা ফেনা ঘূরপাক খাচ্ছে। দেখতে পেল ছোট ছোট নুড়ি বালু, লতাগুল্মের সঙ্গে নানা জাতের মাছও ঘুরপাক খাচ্ছে। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সে জাল বার করল।

[দুই]

এভাবেই রণে তার জীবিকা নির্বাহ করত। রণের বাবাও এইভাবেই জাল দিয়ে মাছ ধরত। দশ বছর আগে এক শ্রাবণের জলপ্লাবনে ঝর্ণার জলে

ভেসে যায় ওর বাবা। এখন সে কথা প্রায় কারোই মনে নেই। সাধারণ মানুষ ভূত-প্রেতকে ভয় পায়। তারা বলে গভীর রাতে চলাফেরা করতে নেই, ভূতপেতনিতে ধরে, অপদেবতায় ভর করে, কবন্ধ-ব্রহ্মদত্যি ঘাড় মটকায়। এই তাদের বিশ্বাস। কিন্তু রণের ক্ষেত্রে এসব খাটে না। রণে যেন নিজেই এক প্রেতাত্মা। ক্রমশঃ সে যেন একটা ভূত হয়ে যাচ্ছে। যখন সংসারের সবাই ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, চেতনাহীন স্বপ্নলোকে বিচরণশীল, চতুর্দিকে গভীর নিস্তব্ধতা সেই সময় রণে ঘন অন্ধকারে হাতে একটি ছোট ডিবা নিয়ে ঝর্ণার পাথরের আড়ালে মাছের সন্ধানে হাত ঢুকিয়ে দেয়। ডিবার অস্থির শিখায় তার রোদজলে পোড়া কুৎসিত চেহারা আরো বীভৎস দেখায়। তার বিষাদমাখা ম্লান মুখ, সাদা চোখ নিয়ে সে ঝর্ণায় নালায়, বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াত। তার এই চেহারা দেখে ঝর্ণার প্রেতরাও ভয়ে তার কাছে ঘেঁসত না।

রণে আর একবার জাল ঘুরিয়ে সেই দহতে ফেলল। অপ্রস্তুত মাছেরা সবাই জালে আটকা পড়ল। রণের পোড়া মুখে হাসি ফুটল। চোখ দুটি আনন্দে উৎফুল্ল। জালের মধ্যে মাছের লাফালাফি।

ছোট বেলায় সে তার মাকে হারিয়েছে। কবে কখন মনেও পড়ে না। পরিবর্তনশীল জগতে সে এখন একা। কল্পনার জগতে সাঁতার কাটতে লাগল রণে। রণে দেখল, ঝর্ণার ধারে ছোট একটি ঘর। বৌ-ছেলে নিয়ে তার সুখী সংসার। একটি শিশু টুকটুক করে হাঁটছে। ও যখন মাছ ধরছে, তার কাছে এসে আধো আধো স্বরে বলছে—বাবা, আমিও মাছ মারব। কথা শুনে মাছ পালিয়ে গেল। ও রেগে গিয়ে চিৎকার করে উঠল—এই গোরের মা বাচ্চাকে এখান থেকে নিয়ে যা। বাজার থেকে মাছ বিক্রি করে ক্লান্ত হয়ে ফেরার পর গোরের মা মিষ্টি হেসে গোলমরিচ দেওয়া গরম চা হাতের কাছে এগিয়ে দিচ্ছে। আপনমনে গার্হস্থ্য জীবনের স্বপ্ন দেখে রণে।

[তিন]

রণে বাঁশের লাঠিতে মাছ ঝুলিয়ে কাঁধে নিয়ে বাজারের দিকে এগিয়ে গেল। হাঁটু পর্যন্ত জলে ভেজা। ঝর্ণার এবড়ো-খেবড়ো পাথরে ঘা খেয়ে দুই পায়ে এখানে ওখানে নীল হয়ে গিয়েছে। খোঁচা লেগে ঘা

হওয়ায় রক্ত চুয়ে পড়ছে। ঠাণ্ডা জলে শরীর হিম শীতল হলেও হৃদয়ের উত্তাপে সে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে।

বড় রাস্তায় পৌছতে একজন জিজ্ঞেস করল,—এই যে দাদা, মাছ কত করে ?

—দুই টাকা সের।

—বাব্বা ঝর্ণার মাছেরও এত দাম ?

—এ আর এমন কি বেশি দাম। এই মাছ ধরতে যা কষ্ট করতে হয়। সারারাত জেগে, জলে ভিজে ধরা। দুই পায়ের ক্ষতের দিকে তাকিয়ে রণে জবাব দেয়। রণের মনে হচ্ছিল এর চেয়ে অনেক বেশি দাম তার বলা উচিত। কিন্তু সঠিক দাম কত হতে পারে, বাজারে না গেলে, দুচার জনের সঙ্গে কথা না বললে জানা যাবে না। বর্তমান মাছের বাজারের দর সম্পর্কে তার ধারণা ছিল না।

সকাল পাচটার মধ্যেই সব মাছ বিক্রি হয়ে গেল। রণে গুনে দেখল পুরো বিশ টাকা হয়েছে। তার আশার গাছের শিকড় ক্রমশঃ মাটির নীচে প্রবেশ করছে। এইভাবে যদি মাছ বিক্রি হয়, তাহলে সব খরচাপাতি করার পর মাসে তিনশ টাকা জমবে। দুই মাসের পরিশ্রমে যে টাকা জমবে, তাতে ছোট্ট একটি ঘর তৈরি করা যাবে। তার অভিলাষের শেকড় চারিদিকে প্রসারিত হতে থাকে।

চিন্তা করতে করতে পথ হাঁটছে রণে। পথের ধারে একটি ছোট নতুন দোকান চোখে পড়ল তার। পঁচিশ ত্রিশ বছরের এক মহিলা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার দেহে যৌবনের প্রলয়ঙ্করী শিখা না থাকলেও যৌবনের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য এখনো শেষ হয়নি।

—এই যে মাছওলা দাদা, আমাদের দোকানেও কখনো কখনো চা খেতে আসতে হয়।

যুবক রণে এমন যুবতী মহিলার সঙ্গে দু একটা কথা বলার লোভ সম্বরণ করতে পারল না। সে বলল—কেন আসব না! কৈ দাও দেখি কি কি আছে। কাঠের বেঞ্চে বসল।

মহিলা এবার যত্ন করে রোটি আলুর তরকারি ও চা এনে রাখল রণের সামনে। ওর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল—মাছ দেব নাকি ?

রণে তাকিয়ে দেখল পাশে থালায় লাল মশলা চোবান মাছ রয়েছে।

দেখেই খেতে ইচ্ছে করে। জিভে জল এসে যায় তার। জিজ্ঞেস করল রণে—কত করে ?

—একটার দাম আট আনা।

চমকে উঠলো রণে। সে যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

—এক টুকরো মাছের দাম আট আনা ? মহিলা একগাল হাসল। বলল—এই মাছ যদি হোটেলে যায় তাহলে এই এক টুকরোর ;দামই দুটাকা হয়ে যাবে। আট আনা তাহলে কি এমন বেশি।

রণে ভাবল, ঠিক কথা, মহিলা যখন বলছে, ভুল নয়। মাছের দাম বেশিই হওয়া উচিত। আমি একদম বোকা তাই এত সস্তায় বিক্রি করেছি। তবু সে ভেবে ঠিক করতে পারল না, মাছের যথার্থ দাম কত হওয়া উচিত।

বারবার আনমনা হয়ে পড়ছে রণে। ঝর্ণার ধারে ছোট একটি ঘর, এবং ঘরণী। চোরাচোখে একপলক দেখল মহিলাকে। মনে হল তার হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে। পরমুহূর্তে সম্বিত ফিরে পেল। তার বিচার বিবেচনা মুহূর্তের জন্যে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। এবার সে জিজ্ঞেস করল—তোমার স্বামী কোথায় ?

সহজভাবেই উত্তর দিল মহিলা—বছরখানেক আগে স্বামী মারা গেছে। বাজারের কাছেই শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুর খুব মায়া করেন কিন্তু শ্বাশুড়ি একদম দেখতে পারেন না। খুব অত্যাচার শুরু করায় ওদের ছেড়ে চলে এসেছি। এই দোকান দিয়েছি।

এই শেষ কথায় রণের মনের আশার আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে ভাবল বিধবা হলে কি হবে, আসলে বয়েস তো খুব বেশী নয়, এক বিধবা বলেই হয়ত আমাকে ভালোও বাসতে পারে। এখন যে কোন ভাবে একটা ছোট ঘর তৈরীর পয়সা জোগাড় করতে হবে।

বিদায় নিয়ে চলে আসার সময় মহিলাটি বলল—দাদা, আবার কিন্তু আসা চাই। আশায় থাকব, নিয়মিত আমাদের দেখা হবে।

রণে আনন্দে আর কথা বলতে পারে না। তার হৃৎপিণ্ড লাফাতে শুরু করেছে।

[চার]

ঝর্ণায় পৌঁছতে সন্ধ্যে সাতটা বেজে গেল। আজ তার মনে দারুণ ফুর্তি, হৃদয়ে উল্লাস। আবার সেই শ্রাবণের অন্ধকার রাত। তারার দল কোথায় গিয়ে আত্মগোপন করেছে কে জানে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরবে ঝরবে ভাব। মেঘের ভীমগর্জন কানে আসে ; সেই শব্দ চারিদিকের পর্বতশৃঙ্গে ঘা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হল।

ঝর্ণা কলকল শব্দে বয়ে চলেছে। হাতে জ্বলন্ত ডিবা নিয়ে রণে ঝর্ণা বেয়ে নামতে থাকে। মেঘগর্জন শোনা গেল। কখনো যে ভয় পায় না, সেই রণে হঠাৎ ভয়ে কেঁপে উঠল। বিদ্যুতের হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে যেন সে দেখতে পেল মৃত পিতা তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছেন। তিনি যেন সাবধান করছেন—রণে, আজ ঝর্ণায় নামিস না। বাপ্ আমার যাস না। মেঘগর্জন যেন বারবার এই একই কথা বলছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। এখন তার মনে অন্য কোন চিন্তা নেই। ধ্যান-জ্ঞান একটাই। প্রচুর মাছ ধরতে হবে। সেই মাছ বিক্রি করতে হবে। সস্তায় দেওয়া চলবে না। দাম বাড়াতে হবে। তারপর একটি ছোট ঘর-ঘরণী-একটি শিশু-সেই দোকানের বিধবা মহিলা—তার মিষ্টি ব্যবহার………।

দহতে পৌঁছে গেল রণে। জাল ফেলল। ডিবার আলোয় সব মাছ এক জায়গায় জড় হয়েছিল। পঁচিশ ত্রিশটা কাতলা, অসলা বুদুনা জালে ধরা পড়েছে। পাথরের ফাটলে হাত ঢোকাল। সেখানেও মাছ। চারিদিকে অজস্র মাছ। এত মাছ কোত্থেকে এল, একথা ভেবে অবাক হল রণে। তার মনে প্রচণ্ড আনন্দ। তার খিদেও পায় না, ঘুমও আসে না। চোখে তার স্বপ্ন। মনে আশা। তার আশার পাখির পাখ্না বড় হচ্ছে। শরীরের পরিশ্রমের কথা তার মনেই পড়ে না।

পশ্চিম দিগন্তে কালো মেঘ জমেছে। পাহাড়ের মাথা হতে প্রবল ধারায় জলস্রোত বেয়ে এলো। প্রচণ্ড গর্জন কানে আসছে তার। জাল থেকে মাছ নিয়ে বড় পাথরের চাতালে জমা করছিল সে। জলের ধারায় সেই মাছ ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এত পরিশ্রম করে ধরা মাছ বয়ে চলে যাচ্ছে দেখে রণের মনে খুব দুঃখ হল কিন্তু মাছের সঙ্গে সঙ্গে সেও যে জলের স্রোতের ধাক্কায় বয়ে চলেছে তখনো তার খেয়াল নেই। জলস্রোতে

বয়ে যেতে যেতে চিৎকার করে বলল সে—, এত মাছের দাম……' কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই অতলে তলিয়ে গেল।

সব শেষ হয়ে গেল। এই দহতে রণের আশা আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষের জন্ম হয়েছিল। মৃত্যুও হল সেই একই জায়গায়। এরপর চারদিকে অসীম নৈঃশব্দ। তার জাল হাতেই জড়ান ছিল। শুধুমাত্র ডিবার শিখাটি কাঁপছিল। যেন সে এদিক ওদিক তাকিয়ে রণেকে খুঁজছে। পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস শিরশির করে বয়ে যাচ্ছে। তারা যেন বলছে—মাছের আসল দাম হচ্ছে এই—অর্থাৎ রণের জীবন।

ঝর্ণা আপন নিয়মে কলকল ধ্বনিতে বয়ে চলেছে। প্রকৃতির নিয়মে কোন বিশৃঙ্খলা নেই।

[শিবকুমার রাই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সিকিমে জন্মগ্রহণ করেন। তিব্বতে গিয়াংসেতে কিছুকাল প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্থায়ীভাবে কার্শিয়াং-এ বসবাস শুরু করেন। পুষ্পরাণী মেমোরিয়াল হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় নেপালী যিনি পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার সদস্য হন বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময়।

পরবর্তীকালে কার্শিয়াঙ আকাশবাণীর প্রযোজক হন। বর্তমানে নেপালী দৈনিক 'হিমালচূলীর' সংযুক্ত সম্পাদক। ১৯৭৮ সালে সাহিত্য আকাদেমীর পুরস্কার পান। উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প গ্রন্থ—ফ্রন্টিয়ার, যাত্রী, শহরে। নাটক রচনায়ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।]

কর্ণ থাপা

—ডাক্তারবাবু

—বলুন।

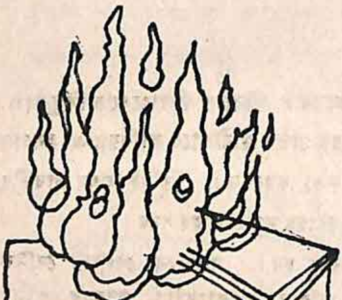
—আমার রুগী বাঁচবে তো ?

—কে ?

—ওই যে আগুনে পোড়া……

—আমি বলতে পারব না। খুব বেশী রকম পুড়েছে।

আমার পুরুষ-হৃদয়ে হাজার বৃশ্চিক-দংশন। দুচোখ থেকে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে আমি ফিমেল ওয়ার্ডের একটি শয্যার দিকে এগিয়ে গেলাম।



ঐ শয্যায়, কাঁধ পর্যন্ত লাল কম্বলে ঢাকা এক নবযৌবনা মহিলা শুয়ে আছে।

শুধু মুখটাই খোলা রয়েছে। আমি তার কাছাকাছি পৌছলাম। হৃদয়ে মমতা ও সহানুভূতি। খুব আস্তে কপালে হাত রাখলাম। খুব ধীরে সে তার চোখ দুটি মেলল। কান্নার মত হাসি হেসে বললাম—এখন কেমন আছো ?

—কালকের চেয়ে ব্যথা ও জ্বালা একটু কম। ধীরে ধীরে বলল সে।

—মনে সাহস রাখো। আর কিছু বলতে পারলাম না আমি। একরাশ পাথর বুকে চেপে বসেছে।

সেই সময় আমি কলেজের ছাত্র। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানো আমার নেশা। কিন্তু সবসময় তা সম্ভব হত না। একবার শীতের ছুটিতে আমার এক বন্ধুর আগ্রহে কয়েকদিনের জন্য তার বাড়ি সিঙ্গলা বাজারে গিয়েছিলাম। গ্রামের পাশে বয়ে যাওয়া রঙ্গিত নদী, ওপারে সিকিম ও তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমার মনে অপূর্ব রসের সঞ্চার করে। সেখানে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার একটি হল—

প্রায়ই আমি বনে-ঝর্নায়, এখানে ওখানে বেড়াতে যেতাম। কখনো কখনো আমার বন্ধুও আমার এই নিরুদ্দেশ ভ্রমণের সঙ্গী হত। তার মারফৎই ঐ গ্রামের অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় হল।

একদিন আমার বন্ধুর সঙ্গে বেড়াচ্ছি। পথের ধারেই একটি ছোট বাড়িতে ও আমায় নিয়ে গেল। ঘরের ভিতরে যেতে, একজন সুন্দরী মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল আমার বন্ধু। তার নাম সবিতা। সেবার তার প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার কথা।

পরিচয় হবার পর আমাদের প্রতিদিন দেখা সাক্ষাৎ হত। তার প্রতি আমার আসক্তি বেড়ে ওঠা স্বাভাবিক ঘটনা। তাও আমার মনে হত, আমাদের দুজনের মধ্যে যেন এক বিরাট দূরত্ব রয়েছে। একদিন আমাকে ও আকস্মিক ভাবেই জিজ্ঞেস করে—গল্প-কবিতা তোমার কতখানি ভালো লাগে?

—দারুণ লাগে। আমার নিজস্ব বিষয় সম্পর্কে ওর উৎসাহ দেখে আমি রোমাঞ্চিত-পুলকিত হলাম।

কয়েকদিন পর।

"আগুন আগুন"। ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। এক পলক তাকালাম চিৎকার শুনে। প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে এলাম। দেখলাম, সবিতাদের বাড়ি দাউ দাউ জ্বলছে। চোখের নিমেষে আমি ছুটে গেলাম সেখানে। আলোর আভাসে দেখলাম, সবিতার মা চিৎকার করে বাইরে থেকে কাঁদছেন—আমার মেয়ে সবিতা ভিতরে আছে।

—কেন? সবিতা কি বাইরে আসতে পারেনি? চারদিকে তাকিয়ে আমি বললাম।

এবার একসঙ্গে অনেকগুলি কণ্ঠস্বর শুনলাম। —তা নয়, সবিতা বাইরে এসেছিল কিন্তু কেন কে জানে কিছু আনবার জন্যে, আবার ভিতরে গেল। এখন ও কিভাবে বেরুবে? তাদের কণ্ঠস্বরে নৈরাশ্য। কয়েকজনের সতেজ সাহসী কণ্ঠস্বর—যেমন করে হোক্ বাইরে আনতে হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন ধরাধরি করে সবিতাকে জ্বলন্ত বাড়ি থেকে বার করে আনল। ওর বীভৎস চেহারা দেখে আমার বুক কেঁপে উঠল। তবু নিজেকে সামলিয়ে আমি সবিতাকে আশ্রয় দিতে ছুটলাম। দেখলাম, দুহাত দিয়ে একটি কাগজের প্যাকেট বুকে চেপে রেখেছে। শরীরের অর্ধেক তার

পুড়ে গেছে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল—এই প্যাকেটটা যত্ন করে রেখে দাও। একথা বলার পরই সে জ্ঞান হারালো।

* * *

—সবিতা।

ধীরে চোখ মেলে সে তাকালো। তার সেই সুন্দর মুখশ্রী তখন মলিন ও হলুদ। অকালে ঝরে পড়া ফুলের মত বিষণ্ণ।

—বোসো, ম্লান কাতর স্বরে সে বলল। কাঠের চৌকিতে আমি বসলাম। আমার নাকে পোড়া মাংসের গন্ধের মত এক ধরনের গন্ধ আসছে।

—সেই কাগজের প্যাকেটটা কোথায় ?

—এই যে! কোটের ভিতর পকেট হতে বার করে তার মাথার বালিশের পাশে রাখলাম। আধপোড়া সেই কাগজের প্যাকেট দেখে তার মুখ স্নিগ্ধ কোমল হয়ে উঠল।

তাকে প্রশ্ন করলাম কৌতূহল ভরে—সবিতা, এই কাগজের প্যাকেটের জন্যে কেন তুমি নিজের জীবনের মায়া পর্যন্ত করলে না ? কি এমন মহামূল্যবান জিনিস এটি ?

—এটি তাঁর স্মৃতিচিহ্ন। তিনি এলে তাঁকে ফেরত দিতে হবে। আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। মৃদু দৃঢ়স্বরে সে বলল।

—তিনি কে ?

—আমার কথাশিল্পী। তিনিই আমার জীবন, আমার দেবতা। তার কণ্ঠস্বরে নিবিড় প্রেম ফুটে উঠল।

একটা বিরাট রহস্যের যেন আবরণ উন্মোচন হচ্ছে দেখে আমি বললাম —সবিতা, আমায় সব খুলে বল। এভাবে আর আঁধারে রেখো না।

তার চেহারায় যন্ত্রণার ছায়াপাত হল। অস্ফুটস্বরে বলল—আমি তোমায় ভুল বোঝাইনি। তবে, কথাটা হচ্ছে, আমার কথাকার বর্তমানে এখানে নেই।

আমি এবার কিছুটা উত্তেজিত স্বরে বললাম—কে সেই নির্দয় কথাকার ? আমাকে তার নাম-ঠিকানা বলো, এখনি আমি তাকে ধরে নিয়ে আসছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও ধীরে বলল—তিনি মৃত্যুর ওপারে রয়েছেন।

—সবিতা, একি হৃদয় বিদারক কথা বলছ তুমি! আমি বিহ্বল কণ্ঠে বললাম।

—এই হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর ঠিক আগে এই গল্পগুলি তিনি আমায় দিয়েছিলেন। যদি পার ছাপিয়ো, এই কথা বলেছিলেন। সেই জন্যই একদিন তোমায় আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, গল্প-উপন্যাস কেমন লাগে। কিন্তু বিধির বিধান কি অপূর্ব! এই প্যাকেটের প্রায় সবটাই পুড়ে গিয়েছে। ধীরে ধীরে তার চোখ থেকে জলের ধারা নামল। আমার দুচোখও অশ্রু-সজল হয়ে উঠল। মনে মনেই বললাম—হে নারী, তোমাকে বোঝা কত কঠিন।

* * * *

সবিতার অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হতে থাকে। প্রায়ই ওর খাটের পাশে বসে থাকি। ও যে বাঁচবে না সে কথা আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

—আমার একটা অনুরোধ রাখবে? করুণ কণ্ঠে বলল ও।

—কি, বল! আমার চোখে জল এসে গেল।

—আমি জানি আমি বাঁচব না। মৃত্যুর পর ঐ কাগজের প্যাকেটটা আমার চিতায় দিয়ে দিও।

তার দুদিন পরই চিরকালের মত চোখ বুজল সবিতা।

সবিতার চিতা জলছিল। আমার হাতে ছিল আধপোড়া গল্পগুলি। ভেবেছিলাম এগুলি সম্পাদনা করে প্রকাশ করব। কিন্তু—

তার সেই কাতর অনুরোধের কথা বারবার মনে পড়ছিল। এবার সেই প্যাকেটটা জলন্ত চিতায় ছুঁড়ে দিলাম। উপস্থিত শবযাত্রীরা অবাক চোখে আমায় দেখছে। কিন্তু ততক্ষণে আমি এক বিরাট পাথরচাপা মন নিয়ে পাহাড়ি পথে ক্রমশঃ উপর দিকে উঠতে শুরু করেছি।

[কর্ণ থামী। ১৯৪২ সালে দার্জিলিঙে জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক ছোটগল্পকার ও কথাসাহিত্যিক রূপে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি হিন্দিতে 'কোবিদ' উপাধি লাভ করেছেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লিখছেন। অনুবাদক রূপেও দক্ষতা অর্জন করেছেন। দার্জিলিঙের নেপালী আকাদেমী তাঁর একটি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বাংলা ছোটগল্প নেপালীতে অনুবাদ করেছেন তিনি।]

জীবন্মৃত

শিবকুমার রাই

রোগা, ফর্সা চেহারা ওর। মাথার চুল পাতলা। সরু লিকলিকে আঙ্গুল। হাত জোড় করে বলল—নমস্তে।

প্রতিদিনকার মত আমি ছোট ভাইকে দেখবার জন্য সাত নম্বর ওয়ার্ডের দিকে যাচ্ছিলাম। দাঁড়িয়ে পড়লাম। বুঝলাম, আমাকে উদ্দেশ্য করেই লোকটি হাতজোড় করেছে। আমিও জবাবে বললাম—নমস্তে। স্বভাবতই ভদ্রতা রক্ষার জন্য দুই পা এগিয়ে গেলাম। লোকটি হেসে বলল—আপনাকে রোজই আসতে দেখি! আপনার নিজের লোক কেউ রুগী আছেন এখানে?



সহজভাবে বললাম—চার মাস হল, আমার অসুস্থ ছোট ভাই রয়েছে এখানে। সাত নম্বর ওয়ার্ডে থাকে ও।

ও বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওয়ার্ড বাবুর কাছে শুনেছি আমি। উনি তো ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন। ডাক্তারবাবু হাঁটার অনুমতি দিয়েছেন। সকাল বিকাল এখান দিয়েই বাইরে যেতে দেখি। এভাবেই আমাদের প্রথম পরিচয় হল।

পরদিন থেকে আমার দেখা করার লোক একজন বাড়ল। ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে ফেরার পথে ওর ঘরেই আমি যেতাম।

পাহাড়ের মাথায় এই বিরাট স্যানাটোরিয়াম তৈরী হয়েছে। প্রায় সত্তরটা ঘরে যক্ষারোগী রয়েছে। দেড়-দুই বছর ধরে আছে অনেকে। নিশ্চল পাথরের মত রাত দিন ওরা খাটে শুয়ে থাকে। বিশ্রাম ও চিকিৎসার পর অনেকে সুস্থ হয়ে সংসার জীবনে ফিরে যায়, কেউ বা এখানেই চিরবিশ্রাম লাভ করে।

আমার এই নব পরিচিত রুগীর নাম শশী। বোঝা যায় সে সুশ্রী, সুন্দর যুবক ছিল। এখন রক্তহীন শীর্ণ চেহারা।

একদিন ওর ঘরে ঢুকে পড়েছি, ও তন্ময় হয়ে কিছু দেখছিল। কোন চিঠি বা ছবি। আমায় দেখেই তাড়াতাড়ি বালিশের নিচে লুকিয়ে ফেলল। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হেসে বলল—আপনি এসেছেন, আমি টের পাইনি! ওর দুচোখে জল। বিস্মিত হলাম। কৌতুহল নিবৃত্ত করতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম—আজ তোমার কি হয়েছে?

বুঝলাম সত্যি কথা বলছে না। ইতস্তত করে বলল—কই কিছুই হয় নি? মনে হয় চোখের জোর কমে গিয়েছে। কোন জিনিস দেখতে দেখতে বা পড়তে পড়তে চোখে জল এসে পড়ে।

বললাম—আজ বোধহয় একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছ।

ও বলল—না, অন্যদিনের মতই। তবে আমি জানি আমি আর বাঁচব না। অথচ আর দু বছর বেঁচে থাকার আমার খুব ইচ্ছে। কিন্তু ক'দিন থেকে সেই আশার দীপও নিভে গেছে। গত দেড় বছর থেকে ক্রমশ শরীরের অবনতি হচ্ছে। ছয়মাস আগে ডাক্তার বললেন, ফ্রেনিক অপারেশন করতে হবে। তাও করা হল। এই দেখুন অপারেশনের দাগ! নীচু হয়ে দাগ দেখতে গেলাম। ওর মুখের কাছাকাছি আমার মুখ নামল। চমকে উঠে চিৎকার করে উঠল ও—না, না, এত কাছে আসবেন না, দূরে থাকুন। জানেন না, যক্ষা খুব ছোঁয়াচে রোগ। আমি তো শেষ হয়ে গেছি, আপনি কেন নিজেকে নষ্ট করবেন?

বললাম—কেন মিছিমিছি এত ভয় পাচ্ছ? যার আয়ু আছে তাকে কে মারতে পারে? ও বলতে থাকে—গতকাল ডাক্তার বলেছেন, 'থরকোপ্লাসটিক' অপারেশন করতে হবে হয়ত। এখানে তো এই অপারেশন হয় না। কলকাতার যাদবপুর টি বি হাসপাতালে মাত্র হয়। একশ বিশ গ্রাম ষ্টেপটো-মাইসিন ইনজেকশন নিতে হবে বলেছেন। দেড় দু'হাজার টাকা পাব কোথায়? আমাদের জীবনের কি-ই বা দাম। ধনী ব্যক্তিরা কুকুর বিড়াল পোষার জন্যে হাজার হাজার টাকা খরচ করে, আর আমাদের পাঁচ দশ টাকা সাহায্য পর্যন্ত করে না।

খুব মন খারাপ লাগল। আমি নিজেই ভুক্তভোগী, তাই ওর অনুযোগ আমার মনের অনুমোদন পেল। অন্যান্য রুগীরা মানুষের সহানুভূতি পায় কিন্তু যক্ষারোগীরা ঠিক অন্যরকম ব্যবহার পায়। আমি দেখেছি, যে মুহূর্তে বাড়ির

কর্তা জানতে পারেন যক্ষা হয়েছে, তখন যে উঠে চলাফেরা করতে পারে না, তাকেও বার করে দেন। কাছ দিয়ে যাবার সময় মানুষেরা নাকে রুমাল চাপা দেয়। নরকের ঘৃণিত জানোয়ারের মত ব্যবহার পায় ওরা। অস্পৃশ্য, অচ্ছুৎ, প্রতিটি মানুষই স্বার্থপর জানোয়ার বিশেষ। অপরকে হত্যা করেও সে নিজে বাঁচতে চায়।

ও বলতে থাকে—যদি আর দুই বছর বাঁচতে পারতাম। এবার সে একনাগাড়ে কাশতে থাকল। কাশতে কাশতে ষ্টিলের বাটিতে থুথু ফেলল। দেখলাম একদলা রক্ত। ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—এত বিচলিত হচ্ছ কেন ? এমন কিছু হয় নি। দুই বছর কেন ? আরো অনেক বছর বাঁচবে। যত সহজে বললাম ঘটনা তত সহজ নয়। আমি জানি, ওকে যা বললাম, তা আমি নিজেই বিশ্বাস করি না। ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম।

আমার ভাই অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠায়, এখন আর প্রতিদিন স্যানাটোরিয়ামে যেতে হয় না। তিন চার দিন পর পর যাই।

একদিন দেখলাম ও কেমন উদাস ভাবে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে। আমাকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরস্বরে বলল—আপনি চার দিন বাদে এলেন। আবার যেদিন আসবেন হয়ত আমাকে এখানে দেখবেন না। তাকে শুধু একবার মাত্র দেখার ইচ্ছা ছিল। সে ইচ্ছা আর পূর্ণ হবে না। মনের সাধ মনেই রইল।

দেখে বোঝা যাচ্ছে ওর জ্বর হয়েছে। তবু ও কথা বলতে থাকল।—আজ আপনাকে দু একটি কথা বলব। একটি করুণ কাহিনী।

বললাম—আজ তোমার জ্বর খুব বেশী, পরিশ্রম করা উচিত নয়। এখন বিশ্রাম কর। তোমার গল্প আর একদিন শুনব। ম্লান হেসে বলল ও—এতদিন বিশ্রাম করলাম, আরাম করলাম, কোন ফল হল না। এরপর আমি অনন্ত বিশ্রাম নেব। কিন্তু তার আগে আমার কাহিনী বলতেই হবে। আমি যদি আজ আপনাকে আমার কাহিনী শোনাতে না পারি, শান্তিতে মরতেও পারব না। আপনি যদি শোনেন, আমার বোঝা হাল্কা হবে।

ও বলতে শুরু করে—যখন আমি ম্যাট্রিক পড়ি তখন থেকেই পুষ্পার সঙ্গে আমার মনবিনিময় হয়। আমরা পরস্পরকে ভালোবাসলাম। কিন্তু কাউকে একথা জানাবার উপায় নেই, কারণ আমরা নিকটাত্মীয়। এ ব্যাপারে

আধুনিক যুবক-যুবতীদের সহানুভূতি পেলেও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বা সমাজ কখনো সমর্থন করত না। ম্যাট্রিক পাশ করে পড়তে গেলাম কলকাতায়। চার বছরের জন্যে। কলেজ জীবনেও তাকে ভুলতে পারিনি! আমি ওর থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছি, ও নিজেও তাই চেষ্টা করত। কিন্তু কোন না কোন সময়ে, কোন পরিস্থিতিতে আমাদের দেখা হয়ে যেত। আজ থেকে তিন বছর আগের কথা। তখন আমি সুস্থ সবল। সেদিন দীপাবলীর সন্ধ্যা। আমি ওদের বাড়িতে গিয়েছি। একটি ডালায় গাঁদাফুল ও মাটির প্রদীপ নিয়ে এলো ও। দুজনে মিলে একটির পর একটি প্রদীপ জ্বালাই। দরজার দুপাশে দুটি প্রদীপ রেখে বলি—পুষ্পা আমাদের জীবন এমনি উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময় হোক।

দুজনে এক এক করে জানালায় দরজায় চৌকাঠে, অঙ্গনে প্রাঙ্গণে মনের আনন্দে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখি। চারদিকে আলোর রোশনাই। দূরের গ্রাম থেকে ভৈলো গায়িকাদের মাঙ্গলিক গানের সুর ভেসে আসছে। অমাবস্যার কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে পুষ্পা বলল—শশী, আমরা আর কতকাল এইভাবে কাটাব? আমি বললাম—অনন্তকাল। যতদিন পর্যন্ত আকাশে চাঁদ উঠবে, আকাশে তারারা জ্বলজ্বল করবে।

তখন আমি জানতাম না মানুষের পরমায়ু এত কম, আনন্দের ক্ষণ আরো কম। আমি লক্ষ্য করলাম পুষ্পার দুই চোখে জল টলমল করছে।

এর কদিন পরই হঠাৎ একটি চিঠি পেলাম আমি। চিঠিতে লেখা রয়েছে—

শশী, তোমার কাছ থেকে কোন সাহায্য বা সহানুভূতি আমি পাইনি। মা বাবার আগ্রহে আমি বিয়ে করতে বাধ্য হচ্ছি। আজ সন্ধ্যায় অন্যের বাড়িতে প্রদীপ জ্বালাতে যাচ্ছি আমি। তোমার পবিত্র প্রেমের মর্যাদা দিতে পারলাম না! ক্ষমা কোর।

—তোমার পুষ্পা

অকস্মাৎ আমার জীবনে রাতের আঁধার নেমে এল। এত তাড়াতাড়ি এমন অঘটন ঘটবে ভাবতে পারি নি। আমার স্বপ্ন সংসার ভেঙ্গেচুরে গেল। ও-তো অন্যের ঘরে আলো জ্বালাতে গেল, কিন্তু আমার ঘরের আলো যে চিরদিনের জন্য নিভিয়ে দিল। জ্বলে পুড়ে আমি খাক্‌ হয়ে গেলাম। একমুঠো

ছাই হয়ে যেন পড়ে রইলাম। দমকা বাতাস এসে সেই ছাইটুকু উড়িয়ে দিলে অনন্তে বিলীন হয়ে যাব।

পুষ্পার বিয়ে হয়েছে কোন এক মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে। বিয়ের পরেই স্বামীর সঙ্গে ও মালয়ে চলে যায়। তিন বছর আগের ঘটনা এটি।

আমি শুনেছি যারা মালয়ে যায় তারা পাঁচ বছরের আগে এখানে আসতে পারে না। মৃত্যুর আগে শুধু একবার তাকে দেখার ইচ্ছা ছিল। সেই জন্যেই আমি আর দু বছর বাঁচতে চেয়েছিলাম। মাত্র দু বছর।

ওর দু চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় জল পড়তে থাকে। আমার খুব খারাপ লাগছে। দুচারটে সহানুভূতিসূচক কথা বলে ভারাক্রান্ত মনে ঘরে ফিরে এলাম।

কদিন পর স্যানাটোরিয়াম থেকে একটি চিঠি এলো। ভাই সুস্থ হয়েছে। ওকে যেন নিয়ে আসি। আর দেরি করা যায় না। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ভাই সুস্থ হয়েছে, এর চেয়ে আনন্দের আর কি আছে!

যেতে যেতে তার কথা মনে পড়ল। কেমন আছে সে কে জানে; একটু ভালো হয়েছে কি! এই সব ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি। স্যানাটোরিয়ামের গেটের আগে গাড়ি দাঁড়াল।

সোজা ভিতরে ঢুকলাম। ওর ঘর পার হয়ে ভাইয়ের ঘরে যেতে হয়, তাই ওকে আগে একটু দেখে যাব ভাবলাম। উঁকি দিয়ে দেখলাম, ঘর শূন্য। ওর জামা কাপড় বিছানাও নেই। ড্রয়ারের ওপরে কয়েকটি শিশি, কমলার খোসা, পচা কলা। সারা ঘরে শিশিবোতল ছড়ানো। ও গেল কোথায়? ভালো হয়ে বাড়ি ফিরে গেল না ঘর বদল করেছে? কিছুই বুঝতে পারলাম না। সোজা ভাইয়ের ঘরে গেলাম। শুনলাম, গত রাত্রে ও মারা গিয়েছে এবং আজ সকালেই সম্মেলনের স্বয়ংসেবকরা ওর লাশ নিয়ে গিয়েছে। বুক ধড়ফড় করছে আমার। সোজা ওর ঘরে চলে এলাম। সেই শূন্য ঘরের চারদিকে দেখতে থাকলাম। এই কদিন আগে, মাত্র দু বছর বাঁচার জন্যে ওর কত আকুতি। আজ ইতস্তত ছড়ানো শিশিবোতলগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে মানুষ কত শক্তিহীন। সবাই যেন ওর আকাঙ্খাকে বিদ্রূপ করছে।

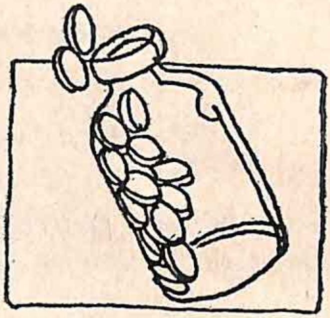
খাটের পায়ার পাশে একটা সাদা মোটা কাগজের টুকরো নজরে পড়ল।

এগিয়ে গিয়ে কাগজটা হাতে তুলে নিলাম। হাতের ওপর মেলে ধরলাম। অপূর্ব স্থন্দর এক মহিলার ফটো। তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—শশীকে সপ্রেম সমর্পণ—পুষ্পা।

জীবনরশ্মি

শরদ ছেত্রী

এই শহরটাই এই রকম ; সামান্য কিছু হলেই হল, কোন কথা বোঝার তর সয় না কারো। রাস্তাঘাট অলিগলি দিয়ে মানুষজন বেরিয়ে আসে এবং উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করতে শুরু করে



—মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ......

এবারও তাই হল।

"ডাক্তার নিরঞ্জন মুর্দাবাদ
জীবনরশ্মি মুর্দাবাদ
মুর্দাবাদ···মুর্দাবাদ"

উন্মাদ মিছিল মূল সড়ক হতে এসে ডাক্তার নিরঞ্জন ভাণ্ডারীর গবেষণাগারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

দেশের বহু আলোচিত বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ডাক্তার নিরঞ্জন ভাণ্ডারীর নাম তালিকার শীর্ষে। সম্প্রতি প্রকাশিত জীবনরশ্মির আবিষ্কার তাঁর এবং তাঁর সহযোগীদের নাম সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত করেছে।

তাঁর গবেষণাগারের প্রধান ফটকে পুলিশবাহিনী মিছিলের প্রচণ্ড ভিড়কে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে অসফল প্রয়াস করে যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে ডাক্তার ভাণ্ডারীর অভিন্নহৃদয় বন্ধু অধ্যাপক হিমালয় শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে বললেন—

—ইস্‌ কি একাগ্র, তন্ময় হয়ে রয়েছেন আপনি। ঐ কোণে বসে কি এত খুঁজছেন ? এ দিকে যে বাইরের লোহার দরজা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত অজস্র মানুষের ধাক্কায় ভেঙ্গে পড়ার দাখিল হয়েছে। —কেন এত বিহ্বল হচ্ছেন আপনি ? কৈ দেখি ? একবার অজগরের মত জনস্রোতের লাইন! জানালার কাছে এলেন ডাক্তার।

—আবার সেই অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে আসছেন ? ওটা দিয়ে মিছিল দেখা যায় না। আগে ওটাকে ওদিকে রেখে দিন। যন্ত্র আমাদের পঙ্গু বানিয়ে দিয়েছে।

অধ্যাপক শ্রেষ্ঠর ব্যঙ্গাত্মক কথা শুনে ডাক্তার ভাণ্ডারী মুচকি হাসলেন। চোখ ছোট করে বাইরের দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে বললেন—খুব দুঃখের কথা, এখান থেকে তো আমি এই বাড়ির চারদিকের ভীমকায় পাচিল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

অধ্যাপক, ডাক্তারের বিদ্রূপ বুঝতে পারেন নি। গম্ভীর হয়ে বললেন—আপনার দৃষ্টি কোনদিন ঐ পাচিল ছাড়িয়ে বাইরে যেতে পারবে না। আপনার পক্ষে ঐ অণুবীক্ষণ, পরমাণুবীক্ষণযন্ত্রই ভালো, ওখানেই জীবন খুঁজুন, যুগান্তর খুঁজুন, তথা সমগ্র জীবনদর্শন ওই যন্ত্রেই অনুসন্ধান করুন।

—হে বন্ধু, হয়ত আজ আপনি সুস্থ নন। ডাক্তার হেসে বললেন।

—কিভাবে সুস্থ থাকব বলতে পারেন। উত্তেজিত হয়ে উত্তর দেন অধ্যাপক।

—কেন? কি এমন হল?

—আপনার পাগলামিতে আমি যথেষ্ট বিরক্ত। এই গবেষণাগারের অন্য সব বৈজ্ঞানিক মিছিল দেখে ভয়ব্যাকুল চিত্তে কাঁপতে কাঁপতে বিশ্রাম কক্ষে জড়াজড়ি করে রয়েছে—অথচ আপনি পাগলের মত ব্যবহার করছেন। এতটুকু ভয়ডর চিন্তা-ভাবনা নেই?

—আজ আমি ভীষণ ব্যস্ত হে বন্ধুবর। আপনার উপস্থিতিকে আমি যথাযোগ্য মর্যাদা পর্যন্ত দিতে পারি নি।

—আমার কথা ছেড়ে দিন, এখন চিন্তা করুন বাইরের ঐ বিরাট মিছিলের মুখোমুখি কিভাবে হবেন। গালাগাল দেবার মতই কর্কশ স্বরে বললেন অধ্যাপক।

—মনে হয় ওরা আণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করার জন্যে মিছিল করছে। আণবিক শক্তিকে নরসংহারক রূপ দেবার পক্ষে আমরাও নই। হে প্রিয় বন্ধু, সমস্ত মানুষের মঙ্গলের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করে এই গবেষণাগারে রয়েছি আমরা। আমাদের এই জীবনতত্ত্বের অনুসন্ধানে কোন আণবিক তত্ত্ব মিশ্রিত নেই। আমাদের সিদ্ধান্ত খুব সরল। সূর্যের মধ্যেকার এক বিশেষ রশ্মি যাকে আমরা জীবনরশ্মি নাম দিয়েছি—সেই রশ্মির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ কি, এটাই আমাদের গবেষণার বিষয়। এর সঙ্গে ওই মিছিলের কি সম্বন্ধ থাকতে পারে?

—আপনি কি বলেন নি যে, মানুষ চিরকাল যৌবনকে ধরে রাখতে পারবে? তার যৌবনাবস্থা কখনো শেষ হবে না। জীবনরশ্মির মুল তত্ত্ব তাই কি না?

—ঠিক কথা। আমাদের অভীষ্ট চিরযৌবনলাভ। রেডিও অন্তর্বার্তায় আমি স্পষ্ট করে বলছি, সূর্য হতে আমরা এক বিশেষ প্রকারের রশ্মি পেতে পারি, যে রশ্মির সাহায্যে শৈশব হতে দ্রুত যৌবনাবস্থায় অভ্যুদয় সম্ভব।

—আপনি তো বলেছিলেন, এই বিশেষ রশ্মি যাতে মানুষ গ্রহণ করতে পারে তার জন্যে এক বিশেষ প্রকারের 'হর্মোন' প্রয়োজন। কৃত্রিম উপায়ে এই হর্মোন গ্রহণ করলে আরো তাড়াতাড়ি যৌবনলাভ সম্ভব একথাও কি বলেন নি?

—উঃ বন্ধু—আপনার ওকালতি পেশা গ্রহণ করা উচিত ছিল। এই কথাটি আমি একবার মাত্র রেডিওর অন্তর্বার্তায় বলেছি। সংবাদ সংগ্রাহক ওই রকমই লোক, নানারকম প্রশ্ন করে আমাকে প্রচণ্ড বিরক্ত করছিল। যেমন এখন আপনি একটির পর একটি প্রশ্ন করে চলেছেন।

—পুরোন কথা রাখুন। বাইরের ওই মিছিল আপনার বিরুদ্ধে। পুলিশ-বাহিনী যে জনতাকে ঠেকাতে পারছে না, আপনি কিভাবে পারবেন? এখন চিন্তা করুন কি উপায় গ্রহণ করবেন।

—মিছিলের সঙ্গে নিশ্চয় কোন রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। রাজনীতির সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

—নাঃ এটা কোন রাজনৈতিক দলের মিছিল নয় বন্ধু, ঐ মিছিল আপনার জীবনরশ্মির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার জন্য। আপনি তো বলেছিলেন শুধু চিরযৌবন নয়, অমরত্ব পর্যন্ত অর্জন করা যাবে। নয় কি?

—বেতার প্রতিবেদকের প্রশ্নটাই এমন ঘোরালো ছিল। তাহলেও চিরযৌবনের সঙ্গে জীবনরশ্মির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। জীবনরশ্মির আশীর্বাদ লাভ করলে একদিন এই পৃথিবী শুধুমাত্র যুবকদের সংসার হয়ে উঠবে। বৃদ্ধাবস্থা শুধুমাত্র আমাদের কয়েকজনের জন্যে। অমরত্বের উপলব্ধিও এই স্থায়ী যৌবনের সঙ্গে জড়িত। শাস্ত্রে যেমন ব্যাখ্যা দেওয়া আছে অমরত্বের, সেইভাবে পর্যায় ক্রমেই হবে।

—কিন্তু হে বন্ধু, ঘটনা একেবারে বিপরীত ঘটেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে

অধ্যাপক বললেন—আপনার ঘোষণার পর অজস্র ভুয়ো প্রতিষ্ঠান দারুণভাবে হর্মোনের ট্যাবলেট বিক্রি শুরু করে দিয়েছে।

—তার মানে? কি ব্যাপার? কোন হর্মোন বড়ি বিক্রি?

—ওই যে, সেই জীবনরশ্মির সঙ্গে সংযুক্ত হর্মোনের ট্যাবলেট বিক্রি।

—কিন্তু আমার তো মনে হয় না হর্মোন তৈরির প্রক্রিয়া বা ব্যবহার কোথাও আমি বলেছি।

—তা যাহোক, বাজারে দারুণ বিক্রি হয়েছে ঐ ট্যাবলেট। বিশেষ কালো বাজারে অনেক দামে বিক্রি হয়েছে। বিদেশ থেকে গোপনে এনে এই ট্যাবলেট বিক্রি করে ব্যবসায়ীরা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছে। তবে দুঃখের কথা, এই বড়ি খাবার পর যুবকরা সব হঠাৎ বৃদ্ধ হতে শুরু করেছে। শহরে একজনও যুবক নেই। এই সেই অকালে বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া যুবকদের মিছিল। এরা আপনার রক্তপান করতে চাইছে।

—আমার রক্তপান করে কি আর হবে! এই মূর্খদের না জেনে শুনে কে বড়ি খেতে বলেছে! অসাধু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানরা ব্যবসা করেছে কিন্তু সরকার কেন এদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি?

—তাহলে, আপনি বলতে চান ঐগুলি আসল বড়ি নয়! বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করেন অধ্যাপক।

—উহুঁ, মোটেই আসল নয়।

—তাহলে?

—যখন বেতার প্রতিবেদকের সঙ্গে আমার জীবনরশ্মি সম্পর্কে কথাবার্তা হয় তখন ব্যাপারটা খুব অস্পষ্ট অবস্থা ছিল।

—অস্পষ্ট অবস্থা! তার মানে? উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করেন অধ্যাপক।

—সূর্যরশ্মির সঙ্গে জীবনের তথা হর্মোনের সম্পর্ক বিষয়ে গবেষণা আজ এইমাত্র শেষ করলাম। এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে। শৈশব হতে যৌবনে পৌছতে কতদিন লাগবে, যৌবনকে রশ্মি দিয়ে কিভাবে কতদিন ধরে রাখা যাবে এইসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে পরীক্ষা দরকার। যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে এখন। কিন্তু বড়ই দুঃখের ব্যাপার কিছু ধূর্ত ব্যবসায়ী অবৈধভাবে বাণিজ্য করে যুবকদের হঠাৎ বৃদ্ধ করে দিল। ওরা তাড়াহুড়ো করে বিষপান করল।

ডাক্তার ভাণ্ডারী যখন এই কথা বলছেন, তখন অকস্মাৎ ঘরের দরজা খুলে গেল এবং উগ্র উত্তেজিত জনতা ঘরে ঢুকতে শুরু করল···একের পর এক···তারা ঘরের মধ্যে ঢুকছে···ঢুকছে···ঢুকছে যেন জনপ্রবাহ নয়, জলপ্রবাহ···

[শরদ ছেত্রী। দার্জিলিঙের তরুণ কথাশিল্পী শরদ ছেত্রী ভানুভক্ত পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন সম্প্রতি। ১৯৮৬ সালে আকাদেমী পুরস্কার পান। সরকারি পেশায় নিযুক্ত থকেও তিনি নিরলসভাবে সাহিত্য সাধনা করে চলেছেন। ছোটগল্প সংকলন 'চক্রব্যূহ'র অন্তর্গত জীবনরশ্মির অনুবাদ করা হল। ছোটগল্প, উপন্যাস, কবিতা, খণ্ডকাব্য, নাটক, শিশুসাহিত্য—প্রতিটি ক্ষেত্রেই শরদ ছেত্রী সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁর এ যাবৎ প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা চৌদ্দ।]

অন্তিম ইচ্ছা

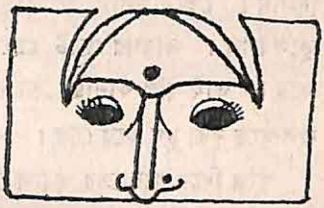
—কাঞ্চী প্রধান

—আরো দুই।

শূন্য গ্লাস পূর্ণ হয়ে ওঠে। এক নিঃশ্বাসে আবার শূন্য হয়ে যায়।

—আরো দুই।"

গ্লাস আবার ভরে দেয়া হল। অল্পক্ষণের মধ্যেই গ্লাসের পানীয় নিঃশেষ।



এবার পয়সা দেবার পালা। শব্দ করে টেবিলে পয়সা রাখল ওরা।

—হে প্রিয়তমা, আমরা তাহলে চলি। আবার আসবো। মাতাল ধনে ও রণে প্রেমমায়ার আপেল-লাল গাল টিপে দিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে টেবিল থেকে পয়সা তুলতে তুলতে, ভুরু কুঁচকে আপন মনেই উচ্চারণ করল প্রেমমায়া—ভাগাড়ের শকুন।

আজ থেকে তিন বছর আগে স্বামী মারা যাবার পরই এই মদের দোকান দিয়েছে প্রেমমায়া।

ওর আশ্রিত রয়েছে দুই ছেলে, দুই মেয়ে। ওকে নিয়ে মোট পাঁচজন। পাঁচটি পেটের খিদে মেটানো এখনো পর্যন্ত দারুণ সমস্যা হয়ে রয়েছে।

পয়সা বাক্সে রেখে এঁটো গ্লাস উঠিয়ে ধুতে বসল প্রেমমায়া। এই সময় কে যেন বাইরে থেকে বলল—কি করছ কানছি? এই কথা বলে এক বৃদ্ধা খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

গ্লাস ধুতে ধুতে বলল প্রেমমায়া—ও জেঠিমা এসেছ? বোসো ওখানে। গ্লাস আলমারিতে রেখে উনুনের পাশে এসে বসল।

—বয়েস ক্রমশ বাড়ছে। একেবারে বুড়ো হয়ে গেলাম। হাঁটাচলা করতেও কষ্ট হয়। অনেক বছর হয়ে গেল, কার্শিয়াঙ-এ আসিনি। আজ আসতে হল, তাই ভাবলাম, তোমার সঙ্গে দেখা করে যাই। ধনমতি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

দুধহীন চা এগিয়ে দিয়ে বলল প্রেমমায়া—আজ কেন এলে কার্শিয়াঙে ? কি এমন কাজ ছিল ?

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বলল ধনমতি—দুঃখের বেলা, সকলে করে হেলা। এমন একটা প্রবাদ আছে না ? তোমায় কি বলব কানছি, বড় ছেলের বিয়ে দিলাম। বিয়ের এক সপ্তাহ পরেই সে আলাদা হয়ে গেল। তাও এক বছর হল। বড় ছেলের ওপর আমার অনেক আশা ভরসা ছিল। ওদের বাবা মারা গেছেন অনেকদিন আগে। বাবার অভাব তাকে বুঝতে দিই নি। আমিই বড় করেছি, পড়িয়েছি। চাকরি পাবার পর বিয়ের ব্যবস্থা করে দিলাম। ভেবেছিলাম, ভালোই হবে। কিন্তু কপাল আমার, বউ পেয়ে মাকে ভুলে গেল। তারপর ছোট ছেলে আমায় এক-আধটু দেখাশুনো করতে শুরু করে। তাই বলি কানছি, দিন খারাপ হলে কি আর করা যায়।—চোখ থেকে জল মুছে বৃদ্ধা চুপ করে গেল।

খুন্তি দিয়ে শূয়োরের মাংস ডেকচিতে নাড়তে নাড়তে বলল প্রেমমায়া—ছোট ছেলের আবার কি হল ?

—কি আবার হবে ! দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধনমতি।—গত রবিবার রাত্রে তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছে। পরে অন্যদের কাছে শুনলাম, যে মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীর কাছে ও চাকরি করত, তার সঙ্গে মাইনে নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। আমার যতদূর মনে হয়, দু-তিন মাসের মাইনে বাকি আছে। এই নিয়ে ঝগড়া-ঝাটি হওয়ায় ওরা মিথ্যে মামলা সাজিয়ে ওকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছে। ওদের টাকা আছে অনেক, তাই ক্ষমতাও বেশি। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার শুরু করে—এখন আমি থানা থেকে ঘুরে এলাম। কথাবার্তা শুনে মনে হল ওর বেশ কিছুদিনের জেল হবে।

প্রেমমায়া জিজ্ঞেস করল—জামিন দিল না ?

—জামিনের জন্য টাকা দরকার। কোথা থেকে দেব ? এই বুড়িকে কে টাকা দেবে ? এই ধনীদের পৃথিবীতে আমাদের মত গরীবকে কে টাকা দেবে ?

—ঠিক বলেছ জেঠিমা। বুড়ির কথায় প্রেমমায়ার হৃদয় দ্রবীভূত হয়।

—বরাবর তো গরীবরাই দুঃখ পেয়ে এসেছে। প্রেমমায়ার দু চোখ জলে ভরে এলো। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলতে শুরু করে—দেখ, প্রায় চারদিন হল, কোলের মেয়ে রূপার জ্বর। গরীব বলেই তো ঠিক মত ওষুধপথ্য করতে পারছি না। তারপর এই মদ বিক্রির আয়ে সংসার চালানো খুবই

কঠিন। কখনো চাল ফুরিয়ে যায়, কখনো ডাল, কখনো কাঠ থাকে না। তখন মনে হয় এই পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে সব জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়োই।

—না, না, অমন চিন্তাও মনে ঠাঁই দিও না। চায়ের পাত্র মাটিতে রেখে ধনমতি বলে সহানুভূতি মাখা কণ্ঠে—এত বয়স হল আমার, বুড়ি হয়ে গেলাম। কত কষ্ট পেয়েছি, কত সহ্য করেছি, আজো করছি। তবু আমার বেঁচে থাকার সাধ রয়েছে। আর তুমি তো এখনো যুবতী। তাও মরার কথা বল। শোনো বলি, দুঃখ আসে, আবার চলেও যায়। আর কখনো এমন কথা বোলো না। তোমার ছেলে মেয়েদের কি হবে ভেবে দেখেছ?

মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইল প্রেমমায়া। ধনমতিও কিছু সময় চুপচাপ বসে চিন্তা করতে লাগল। এই ঘরের মধ্যে এখন এক বিরাট শূন্যতা হাঁ করে আছে।

মোড়া সরিয়ে উঠল ধনমতি—তাহলে আমি উঠি কানছি। এবার যেতে হবে।

—আচ্ছা জেঠিমা। দরজা পর্যন্ত এলো প্রেমমায়া।

একটি মাত্র ঘর। সেখানেই শোবার জায়গা। একপাশে উনুন। ধন-সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে একটি ছেঁড়া কম্বল, ফুটো বাসনপত্র, মোড়া, এক পা ভাঙ্গা টেবিল, ভাঙ্গা একটি টিনের তোরঙ্গ। দেয়ালে বুদ্ধ ভগবানের একটি ছবি টাঙ্গান, ধোঁয়া লেগে ম্লান।

খাটের ওপর শুয়ে আছে একটি রুগ্ন শিশু। নিচে ভিজে মাটির ওপর বস্তা পেতে শুয়ে রয়েছে আর তিনজন শিশু।

এইসব দেখে শুনে অনায়াসে অনুমান করা যায়, এই ঘর নিশ্চয় কোন এক দরিদ্র মানুষের বাসগৃহ।

হ্যাঁ, এটিই গরীব মেয়ে প্রেমমায়ার ঘর। প্রথম প্রথম মদ বিক্রির টাকায় কোনও রকমে ওর সংসার চলতো। কিন্তু রূপার অসুখ হবার পর থেকে ওর পক্ষে সংসার চালানো কঠিন হয়ে উঠেছে। কারণ প্রতি মুহূর্তে অর্থাভাব। বাইরে থেকে এসে, মাথায় একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে, প্রেমমায়া উনুনের কাছে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল। রাত প্রায় দশটা বাজে। এই সময় জ্বরে জর্জর রূপা—মা খিদে পেয়েছে, বলে কেঁদে উঠল। প্রেমমায়া চুপচাপ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মাত্র।

কাঁদতে কাঁদতে এবার বলল রূপা—খিদে পেয়েছে মা। খাবার কিছু থাকলে আমায় দাও না। প্রেমমায়া তার কাতর দুই চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল—বাড়িতে কিছুই নেই মনা।

— কিছুই নেই মা ?

— না মনা, কিছুই নেই। ঘরে এক মুঠো চাল পর্যন্ত নেই। কদিন ধরে অভুক্ত প্রেমমায়া মেয়েকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল।

রাত কাটল। দিন এলো। কয়েক মাস পার হল। এরই মাঝে একদিন পেটে দারুণ খিদে নিয়ে রূপা এই সংসার ছেড়ে চলে গেল। মেয়ের মৃত্যুর জন্যে, ঘরের দারিদ্র্যের জন্যে, নানা কারণে, প্রেমমায়ার শরীর দিনের পর দিন শুকিয়ে যেতে লাগল। তবু কোনভাবে সে বেঁচে রইল।

— প্রেমমায়া ঘরে আছো নাকি? বলতে বলতে ধনে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

— কে ? দুর্বল কণ্ঠস্বর প্রেমমায়ার।

— ও হো, ঘরেই আছ তাহলে! মোড়ায় বসতে বসতে বলল ধনে—এই শীতের রাতে গরম চায়ের ব্যবস্থা হোক তাহলে।

— কি বলছেন দাদা ? মদ ?

— তাছাড়া আর কি হবে! মাত্র এক গেলাস হোক।

— তা দাদা, মেয়ে মারা যাবার পর দিন থেকে মদ বিক্রির কারবার একদম ছেড়ে দিয়েছি।

— ও হো। সেই ব্যবসা তাহলে বন্ধ করে দিয়েছ? ধনের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়। কোন কথা না বলে প্রেমমায়া শাক কাটতে লাগল।

— তাহলে সেই ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছ? ভালোই আছো। খুব ভালো। তাহলে অন্য কিছু পাওয়া যাবে কি ? মুখে তার রহস্যময় হাসি।

আর কি চান ? ধনের কথার মানে বুঝতে না পেরে মাথা উঁচু করে জিজ্ঞেস করল প্রেমমায়া।

—আমার কথাটা বুঝতেই পারলে না বোন। এতো বোকা তুমি! গোঁফে তা দিতে দিতে বলল ধনে—দারুণ শীতও পড়েছে! আজ সারারাতের জন্যে পাঁচ টাকা দেব। শীতের রাতে গরম হওয়া যাবে।

—ও তাই বলুন! এতক্ষণে যেন বুঝতে পারল প্রেমমায়া।—কিন্তু এখানে

তো পাওয়া যাবে না। ও পাড়ার মাইলির কাছে যেতে পারেন। লজ্জায় মাথা নিচু করে বলল প্রেমমায়া।

— কি ? তাই যদি বল, তবে তার কাছেই যাব। চোখে একরাশ লোভ মাখিয়ে বলল ধনে—তা তার কাছে না গেলে চলে না ? তোমার কাছে পাওয়া যাবে না ?

—আমায় আপনি কি ভেবেছেন দাদা ? কণ্ঠস্বর যথেষ্ট দৃঢ় করে বলল প্রেমমায়া।— আমি কি দুশ্চরিত্রা ? বিস্ময়ে ক্রোধে কাঁপতে থাকে সে।

— হ্যাঁ, তাই ভেবেছি, তাই তো মনে হয় আমার। রোজই যে এখানে আসব তা তো বলিনি। ঠিক আছে পাঁচের জায়গায় দশ দেব। কথা বলতে বলতে দশ টাকা পকেট থেকে বার করে, তার টেবিলে রাখল ধনে।

—কি ? এত বড় কথা ! আমি বেশ্যা ? ঝট করে কুকুরি বার করল প্রেমমায়া। বলল—মনে রেখো আমি মদ বিক্রি করেছি, কিন্তু নিজের ইজ্জত বিক্রি করতে বসিনি। আমি গরীব। কিন্তু গরীব হলেও আমার কাছে ইজ্জত বড়। একজন অসহায়া, প্রায় নিরাশ্রয় মহিলাকে দেখে মায়া হয় না ? আমার ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে এসেছিস ! আয় দেখি কত সাহস। গায়ে হাত দে। একথা বলেই খোলা ভোজালি দিয়ে ধনেকে মারতে উদ্যত হল।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে, ধনে একলাফে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে দৌড় দিল। প্রাণে বেঁচে গেল।

যেন একটা বিরাট ঝড় বয়ে গেছে। প্রেমমায়ার মন দারিদ্র্যের গ্লানিতে ভরে গেছে। সে মনমরা হয়ে বসে পড়ল।

কয়েক মুহূর্ত পরে। দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল একজন নারী ! যে কান্নার শেষ নেই। অনন্তকাল চলবে এই কান্না।

———

[কাজী প্রধান—১৯৩৪ সালে কার্শিয়াং-এ জন্মগ্রহণ করেন। দার্জিলিঙ হিমালয়ান রেলওয়ের কর্মচারী। বাস্তব জীবন ভিত্তিক রচনায় উৎসাহী। কিন্তু তাঁর যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী খ্যাতি অর্জন করতে পারেন নি। ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনায় দক্ষতা অর্জন করেছেন। 'নেপালী আকাদেমী' ছোটগল্প সংকলনে তাঁর রচনাকে স্থান দিয়ে মর্যাদা প্রদর্শন করেছে।]

বন্ধ

—দীনানাথ শর্মা

কাল পর্যন্ত বাজারে পথে মানুষের কোলাহল ছিল ; চারদিকে ভিড় হৈ-চৈ। কিন্তু আজ সেখানে শ্মশানের নৈঃশব্দ। আজ নাকি হরতাল। দোকান বন্ধ।



সিনেমা হল বন্ধ। রেল-মোটর বন্ধ। ঘোড়া-গাড়ি বন্ধ। বাজার বন্ধ। চার পাঁচ জন কৃষক পথ দিয়ে যেতে যেতে ভাবছে, বন্ধ? কিসের বন্ধ? কি জন্যে হরতাল? প্রশ্নের জবাব পায় না। তারা দেখে কয়েক জন ক্রুদ্ধ যুবক ইট ও পাথর ছুঁড়ছে।

অসুস্থ বৃদ্ধা মাকে বিছানায় রেখে চুপি চুপি বিহ্বল সন্তে ঘরের বাইরে চলে এল। পাঁচদিন ধরে অসুস্থ মায়ের মুখে অন্ন জোটেনি। কদিন ধরে কাজ পাচ্ছে না সে। সম্পূর্ণ বেকার।

দশ ক্লাস পর্যন্ত লেখাপড়া করে ছেড়ে দিয়েছে সন্তে। খরচে কুলোতে পারেনি বলে। আজ পথের কুকুরের মত এ গলি, ও গলি ঘুরে তাকে কাজ যোগাড় করতে হচ্ছে।

সেখান থেকে সোজা চালের দোকানে পৌঁছে যায় সন্তে। দোকান বন্ধ। দরজায় ধাক্কা দেয়। অনেকক্ষণ পরে দোকানের ঝাঁপ একটুখানি খোলে।

—মহাজন আধ কিলো চাল দিন। হাতের ওপর গামছা খুলে সন্তে বলে।

—ভাই, চাল তো নেই, আজ বাজার বন্ধ। তুমি চলে যাও। ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়। ঝাঁপ বন্ধ হবার শব্দে সন্তে চমকে ওঠে। সেখান থেকে আর একটি দোকানে যায়। তারপর আর একটিতে। সব বন্ধ। তার সারামুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে। নিজের কায়িক শ্রমের বিনিময়ে, অনেক কষ্টে অর্জিত দু টাকা দিয়ে চাল কিনতে পারলে মা ও ছেলে একবেলা পেটপুরে খেতে পারবে এই আশা তার ছিল কিন্তু এখন সেই আশা নিরাশায় পরিণত হচ্ছে। গতকাল পর্যন্ত তার কাছে কানাকড়িও ছিল না। বাজারে ছিল থরে থরে

বস্তায় সাজানো কত রকমের চাল—হিলো, কলম, কালানুনিয়া, চম্পাসরী। আজ ওর কাছে পয়সা আছে, একবেলার মত চাল কেনার ক্ষমতা আছে অথচ আজ সব বন্ধ।

এবার সে পথের ধারে ফেলে আসা প্রধান খুড়োর দোকানে ফিরে এল। দোকানের ঝাঁপ খোলা দেখে ওর চোখে আশার আলো জলে ওঠে।

—জলদি কর, জলদি কর, কিন্তু আজ চার টাকা কিলো দরে চাল।

—ও…… তাহলে আমায় আধ কিলো চাল দিন।

চাল নেবার জন্যে সন্তে গামছা পেতে দেয়। প্রধান খুড়ো চাল মাপার জন্যে মাপযন্ত্র ঠিকঠাক করে। এই সময় আট নয় জন যুবক দোকানে ঢুকে পড়ে। তারা এক একটি চালের বস্তা ধরে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে। মুহূর্তে পথে পড়ে থাকা চাল লুট হয়ে যায়। সন্তে নির্বাক, বিস্মিত, বিমূঢ়। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন চিৎকার করে ওঠে—জানোনা আজ বাজার বন্ধ?

প্রধান খুড়ো সকলের মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নেয়।

আর একজন গর্জন করে ওঠে—বন্ধ জানা সত্ত্বেও কেন দোকান খুলেছিস?

তৃতীয়জন সন্তের দিকে তাকিয়ে বলে—এই দালাল, তোর কি আজই চাল শেষ হয়ে গেছে?

সন্তে তখন রাস্তায় পড়ে থাকা চালের বস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওদের প্রশ্নের কোন উত্তর সে দিতে পারে না। চোখে জল এসে যায়। সে নীরবে গলির দিকে হাঁটতে থাকে। বার বার একই কথা ঘুরে ঘুরে আসে তার মাথায়—"জানো না আজ হরতাল? বাজার বন্ধ।……এই দালাল, আজই তোর বাড়িতে চাল ফুরিয়ে গেল?"

হরতাল, বন্ধ্; নেতাদের প্রভাব বিস্তারের অস্ত্র, পুঁজিপতিদের কালাবাজার করার প্রক্রিয়া মাত্র। রেল বন্ধ্ হয়। কর্মচারী মজদুরদের রুজি রোজগার বন্ধ হয়। দিনভোর পেটে গামছা বেঁধে রাখতে হয়। গরীব কর্মীরা উপোস করে, কাজকর্ম সব বন্ধ থাকে। এই দিনটি হরতালের, পুঁজিপতিরা ধ্বংস হোক। কচি কোমল কণ্ঠেও গানের মত এই আওয়াজ ভাসে। কিন্তু হরতাল বা বন্ধ্ সন্তেকে এক মুঠো অন্ন দিতে পারে না।

মানুষ হয়ে জন্মানোই এক সমস্যা। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পেট নিয়ে আসে মানুষ। একটা মাত্র পেট হলেই বা কি! সমস্যা অজস্র। এক মুঠো অন্ন সংগ্রহ করাও কঠিন কাজ। এখানে এক মুঠো অন্নের জন্যে খালি-পেটের সংখ্যা প্রচুর।

বন্যার্তদের জন্যে, খরাপীড়িতদের জন্যে, লঙ্গরখানা খোলা হয়। তাদের জন্যে ঠিকাদার নিযুক্ত হয়। ব্যবস্থাপক, কর্মচারী থাকে। এখানে নোট দিয়ে ভোট কেনা হয়। গুণ্ডামি ও অরাজকতায় যারা হাত পাকায় তারাই মহান নেতা বা মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখে। চোরের হাতে নিজেদের শিল্প-সংস্কৃতি বিক্রি করে দেওয়া হয়। এক মুঠো ভাতের জন্যে ইজ্জত ও কৌমার্য বিক্রি করে দেওয়া হয়। আধভেজান দরজা আস্তে খুলে সন্তে ভিতরে আসে। সে হতাশ, বিহ্বল, বিধ্বস্ত। দরজা খোলার শব্দ পাবার পর একটি করুণ মমতা মাখানো কণ্ঠস্বর কানে আসে—চাল এনেছিস, সন্তে ?

সন্তে চুপ করে থাকে, লজ্জায়, সঙ্কোচে, পরিস্থিতির চাপে, হতাশায়। তার শরীরের রক্ত যেন শুকিয়ে আসে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় সন্তে মেঝের ওপর বসে পড়ে।

হতাশা মানুষের চরম শত্রু। হতাশা কখনো মানুষের জীবনে অভিশাপ হয়ে আসে। হতাশ হয়ে মানুষ অনেক ভয়াবহ কাজ করে বসে। মানুষ মানুষকে সাধারণতঃ হত্যা করতে চায় না ; কিন্তু এই অবস্থায় মাথায় খুন চেপে যায়। চুরি, হত্যা, আত্মহত্যা, জঘন্য অপরাধ করে সাজা পাওয়া—এসব মানুষ কখনো শখ করে করে না। হতাশা থেকেই এই সব হয়। মানুষের মনের এ এক বীভৎস ছবি।

সূর্য অস্তাচলে যায়, সন্ধ্যা নামে। ওদিকে পাশ ফিরে দলা পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে মা। সন্তে একমনে চিন্তা করছে। গলির শেষ প্রান্তে ফতেহ্‌চান্দের গুদাম। কালোবাজারের শ-খানেক বস্তা চাল গুদামে পচছে। মাটির নিচের ভাঁড়াড়ে লুকোন রয়েছে কত শত বস্তা। আর সন্তের বাড়ির চারপাশে মাটি খুঁড়লেও এক ফোঁটা চাল মিলবে না।

এটা জনগণের রাজত্ব ঠিক কথা কিন্তু নেতা ও পুঁজিপতিদের হাতেই রয়েছে মানুষের প্রাণ ধন মান। নেতাদের গর্জনে বাজার বন্ধ্ হয়, হরতাল হয়। বাজার থেকে সব মাল অদৃশ্য হয়। সব চলে যায় কালোবাজারের অন্ধকারে। সন্তের মত গরীব মানুষ একবেলা খাবার জন্যে চাল কিনতে গিয়ে কিনতে পারে না। হরতাল তার চাল কেড়ে নেয়। পুঁজিপতি লুকিয়ে ফেলে।

চুরি করা অন্যায়, অপরাধ। সন্তে দু তিনবার এগিয়ে যায়, পিছিয়ে আসে। তার মন বিক্ষিপ্ত। নানারকম চিন্তা করে, বিচার করে, তার রাগ হয়। দু হাত মুষ্টিবদ্ধ করে। কোথাও বস্তা বস্তা চাল পচে যাচ্ছে……

কারো বা একমুঠো চালের জন্যে প্রাণ যায়। বড় ও ধনবানদের মধ্যে যদি নৈতিকতা না থাকে, গরীব ও অভুক্তদের আবার কিসের নীতিবোধ। অন্যায় …অপরাধ…চিন্তা করা…এটা দুর্বল হৃদয়ের পরিণামমাত্র।

ক … র‍্যা … ক … ক … স … র … র … র … বড় এক সসপ্যানভর্তি চাল নিয়ে বেরিয়ে এল সন্তে। কিন্তু ফতেহ্ চান্দের গুদামের চৌকিদার তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলল।

— চোর…চোর…চোর…চারদিকে হল্লা — চিৎকার।

সন্তে ধরা পড়ে গেল। তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হল। তারপর হাজতে পোরা হল। পরদিন বিচারের জন্যে আদালতে নিয়ে এল।

জজ্‌সাহেবকে সে তার করুণ কাহিনী শোনায়। সব সত্যি কথা বলে। কিছুই গোপন করে না। ঘটনা শুনে জজসাহেবের মন নরম হয় কিন্তু তিনি নিরুপায়। যে কোন কারণেই চুরি করুক, চোর সবসময়ই চোর। আইন অনুযায়ী তার বিচার হবে। সন্তের ছয় মাসের জেল হল। আদালতের ফয়সালা শুনে সন্তে চিৎকার করে ওঠে, কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। সে চেঁচিয়ে বলে—আমি চোর নই, আমি চুরি করিনি। আমি গরীব তাই গুদাম থেকে চাল নিতে গিয়েছিলাম। আমাকে ক্ষমা করুন হুজুর।

কিন্তু তার কান্না ও চিৎকার কে শুনবে ? দেশ বধির হয়ে গিয়েছে। অন্ধ হয়ে গিয়েছে। নেতা ও পুঁজিপতিরা সন্তেদের সংখ্যা বাড়াচ্ছে। ন্যায়ের প্রহসন চলছে মাত্র। জালঢাকা পুলিশ গাড়িতে ওকে জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পথে পাঁচ ছয় জন শবযাত্রীকে দেখতে পেল সন্তে। তারা মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে এগিয়ে চলেছে শ্মশানের দিকে। সে জানালার জালের ফাঁক দিয়ে শব ও শববাহকদের দেখে। এবার তার মুখ দিয়ে একটি করুণ আর্ত চিৎকার বেরিয়ে আসে—মা —মা—গো…।

[দীনানাথ শর্মা—১৯৪০-এর ১১ই এপ্রিল জলপাইগুড়ি জেলার মাক্রাপাড়ায় জন্ম। বাল্যকাল হতেই সাহিত্য চর্চা করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে 'প্রথমা' উত্তীর্ণ। প্রথম রচনা ১৯৫১-য় পশ্চিমবঙ্গাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রচনাটির নাম "জাগ জাগ নেপালী"। 'হাস্রো ধ্বনি' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। ছোট গল্পকার রূপেই খ্যাতি অর্জন করেছেন। প্রগতিশীল লেখক। আধুনক চিন্তাধারা ও মননে সমৃদ্ধ।]

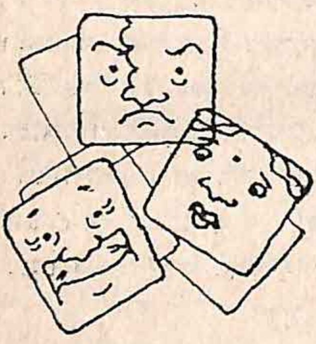
একদিন

—প্রভাবতী রোকা

আটটা বেজে গিয়েছে। কার্কী প্রাতঃকৃত্য সেরে জামাকাপড় পরে তৈরি হচ্ছে।

—কোথায় যাচ্ছো ? মুখের ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে চোখ বুজেই প্রশ্ন করল মোতির মা। ও প্রতিদিনই বেলা করে ওঠে।

কার্কী রেগে গেল। —পেটে ভাত আসে কোথেকে ? টাকা পয়সা আসে কোথেকে ? দিনরাত খেটে কেরানিগিরি না করলে মুখে ভাত উঠবে কিভাবে ? এবার একটু নরম হয়ে বলল—অত অবুঝের মত জিজ্ঞেস কর কেন ? আটটা বেজে গেছে অথচ তোমার এখনো চোখের আঁধার কাটেনি।



কথার মাঝখানেই শব্দ করে হাই তুলল মোতির মা। চোখে একরাশ ঘুম। কার্কীর চোখ রক্তবর্ণ হল।

—খাবার কোন ব্যবস্থা করবে কি.?

—অত রাগ করছ কেন তুমি ?

আধো আধো গলায় বলল মোতির মা। আধঘণ্টার মধ্যে সব কিছু তৈরি করে দিলেই হল তো ? এখনো তার ভাল করে ঘুম ভাঙ্গেনি।

এবার শুরু হল ঘোড়দৌড়। এখানে বাসন কোসনের শব্দ, ওখানে জল পড়ার আওয়াজ, ছুটোছুটি চিৎকার চেঁচামেচি ক'রে মোতির মা খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আজ অন্য দিনের চেয়ে বিশ মিনিট বেশী শুয়ে থাকার মাশুল হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। খুবই পরিশ্রম হচ্ছে আজ। ভিতর থেকে কার্কীর গলার স্বর শোনা গেল—কিগো ভাত হল ? নটা বেজে গেছে।

জলন্ত উনুনে আবার কাঠ গুঁজে দিয়ে বলল মোতির মা—এত ব্যস্ত হলে চলে। ভাত এখনো ফোটার সময় পায়নি। এত সকালে কিসের যে অফিস বুঝি না।

—আমার আর একটুও সময় নেই। কার্কী আরো ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এই ব্যস্ততার মধ্যে মোতি এসে মার কাছে দাঁড়াল—মা খিদে পেয়েছে, খেতে দাও। খ্যানখ্যান শুরু করল। খিদে পাক বা না পাক মাকে এইভাবে বিরক্ত করা ওর অভ্যেস। ভাতের হাঁড়ি থেকে হাতা বার করে ওর মাথায় এক বাড়ি মারল ওর মা—এই তাড়াহুড়োর সময় আমায় আরো পাগল বানাবি তুই? যা ভিতরে যা। মোতি চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিল।

ভাত তরকারি রান্না শেষ করা অসম্ভব বুঝলো ও, তাই স্বামীর কাছে গিয়ে নম্রভাবে বলল—আজ তোমার একটু দেরি হবে···তার চেয়ে দুটো হাঁসের ডিমের ওমলেট করে দি···

—যা আছে তাতেই হবে, তাই দাও। আজো আবার সাহেবের গালাগালি শুনতে হবে। কার্কীর চোখে মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে। মোতির মা খুশি হয়ে রান্নাঘরে ছুটল।

দু মিনিট যেতে না যেতে ও আবার ছুটে এলো ঘরে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—ডিম নেই দেখছি। তাহলে একটু হালুয়া তৈরি করে দিই?

—হাতে সময় নেই, কখন আর তৈরি করবে?

ঠিক এই সময় ঢং করে শব্দ হল ঘড়িতে। সাড়ে নটা। কার্কী এক লাফে উঠে দাঁড়াল। —হয়েছে। এখন আর খাবার সময় নেই। আজ অফিসেই যাহোক কিছু খেয়ে নেব। কৈ আমার ছাতা কোথায় গেল?

মোতির মা ওর সামনে এসে পথ আটকিয়ে কাতর ভাবে বলতে শুরু করল—পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কর। এটুকু দেরি হলে কি এমন ক্ষতি। খেয়েই যাও, তোমায় খেতেই হ'বে। না খাইয়ে তোমায় কিভাবে অফিসে পাঠাব আমি? তার কণ্ঠস্বরে বেদনা ও মমতা ঝরে পড়ে।

—দেখছ না আমার কত দেরি হয়ে গিয়েছে। আর এক মিনিটও দেরী করতে পারবো না। এই কথা বলে পকেটে কলম পেনসিল আছে কি নেই দেখে ছাতা হাতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল কার্কী।

মোতির মা এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল—খেয়ে গেলেই পারতে। একটু-খনের দেরীতে কি এমন আসে যায়? এবার দু হাত দিয়ে স্বামীর হাঁটু জড়িয়ে ধরে। কার্কী বিরক্তি সহকারে ওর হাত ছাড়িয়ে দরজার দিকে যাবার চেষ্টা করছে। যেন একটি সুন্দর নাটকীয় মূহূর্ত।

ঠিক এই সময় কে যেন বাইরে থেকে দরজায় শব্দ করল। এবার কার্কীর মাথা আরো গরম হয়ে গেল। —কে এলো আবার এই অসময়ে? যত্তো সব——

দরজা খুলে গেল। একগাল হাসি নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে নারারণ। তার সব কটি দাঁত বের করে ভুরু নাচিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে জানতে চাইল —এই সাত সকালে কোথায় চললে দাদা?

দারুণ রেগে গেল কার্কী। এ কোন ধরনের রসিকতা? রাগতস্বরে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—কোন চুলোয় আবার, অফিসে। আজ বাড়িতেই দশটা বেজে গেল দেখছ না! কালও দেরি হয়েছে। আজ আবার—

নারায়ণ হাসল। রহস্যময় হাসি। দাঁত বার করে হাসিমুখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

কার্কী ও মোতির মা অবাক চোখে তাকিয়ে রইল নারায়ণের দিকে। ও এমন পাগলের মত হাসছে কেন?

বেশ কিছুক্ষণ পর হাসি থামিয়ে নারায়ণ বলল, তোমরা কি পাগল হয়ে গিয়েছ? কিসের আফিস? কোন আফিসে যাচ্ছো আজ? আজ তো রবিবার।

—কি বললে? অপলক চোখে মূর্তির মত নারায়ণের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল কার্কী—র-বি-বা-র?

—হাঁা, ঠিকই তো, তাইতো, আজ তো রবিবার, ছুটির দিন। কার্কীর কানের কাছে মুখ নিয়ে চিৎকার করে বলল এবার মোতির মা।

—তাইতো এলাম বৌদির হাতের চা-হালুয়া খেতে। বলল নারায়ণ।

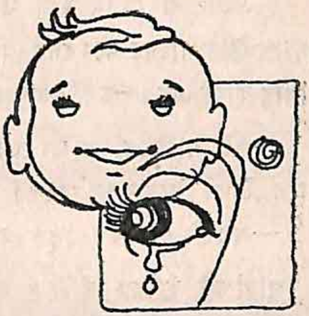
ততক্ষণে সারা ঘর পোড়া ভাতের গন্ধে ভরে গিয়েছে।

[প্রভাবতী রোকা—দার্জিলিঙ জেলার অন্যতম মহিলা লেখিকা প্রভাবতী পঞ্চাশের দশক হতে সাহিত্য রচনা শুরু করেন এবং অতি অল্পকালের মধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যক্ষেত্র হতে কোন এক অজ্ঞাত কারণে সরে গিয়েছেন। বর্তমানে লেখেন না। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর প্রচুর গল্প প্রকাশিত হয়েছে। দার্জিলিঙের নেপালী আকাদেমী তাদের গল্পসংকলনে প্রভাবতীর ছোটগল্প সংকলিত করেছে।]

ছন্না

—প্রকাশ রাণা

আজো মহেশ তার স্ত্রী বিমলার জন্যে একটা নতুন বেনারসী শাড়ি নিয়ে এলো। ও প্রায়ই নিজের স্ত্রীকে খুশি করার জন্যে কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসে।



—কেমন লাগছে ? বিমলাকে জিজ্ঞেস করল মহেশ।

—ভাল হয়েছে। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল বিমলা।

কিন্তু এত সুন্দর একটি উপহার পেয়েও কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করায় বিস্মিত মহেশ আবার জিজ্ঞেস করল—কেন, রঙ পছন্দ হয়নি ? নীল রঙটাই তো তোমার পছন্দ।

বললাম তো পছন্দ হয়েছে।—শাড়ি ভাঁজ করতে করতে বলল বিমলা। তার কথায় সামান্য প্রসন্নতা বা উল্লাস নেই। নিজের স্ত্রীর এমন উদাস ভাব দেখে মনে মনে আহত হল মহেশ। শাড়ি তাকে রেখে বিমলা চুপচাপ রান্নাঘরে গেল।

শোফার কাত হয়ে আধ শোয়া অবস্থায় চিন্তা করতে থাকে মহেশ। তার চোখের সামনে, স্ত্রীর উদাস নিশ্চল চেহারা ভাসছে। ভাবে সে, বিমলা কেন এত উদাস। চুপচাপ মুখ অন্ধকার করে কেন বসে থাকে, একা-একা ? মনে হয় এই বাড়িঘর এই পরিবেশ ওর মনের মত হয়নি। তাছাড়া সে-তো সারাদিন অফিসে থাকে, ঘরে বিমলা একা থাকে, ওর একা একা খারাপ লাগা স্বাভাবিক। মনে মনে ভাবে মহেশ।

—এই নাও চা। চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলে বিমলা। মহেশ চুপচাপ চায়ের কাপে চুমুক দেয়। বিমলা কাছে বসে নিঃশব্দে সোয়েটার বুনে চলে। ঘরের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন নীরবতা বিরাজ করে।

চা পান শেষ করে বিমলার দিকে চেয়ে বলে মহেশ, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। চল, নভেলটি পর্যন্ত বেড়িয়ে আসি।

একপলক নিজের স্বামীর দিকে তাকালো বিমলা। তার চোখে মুখে মৌন প্রশ্ন ফুটে ওঠে। আজ কেন হঠাৎ এই পরিবর্তন ?

—নাও তাড়াতাড়ি কর। বিস্মিত বিমলাকে আবার বলল মহেশ।

—কোথায় যাবে ? অলস কণ্ঠে প্রশ্ন করে বিমলা।

—এসো না তৈরি হয়ে তারপর দেখা যাবে। ওর কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা। চুপচাপ উঠে পাশের ঘরে গেল বিমলা। অল্পক্ষণের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিজের স্বামীর কাছে এল।—চল, কোথায় যাবে। একটু হেসে বলে ও।

—এই শাড়িতে, সত্যি তোমায় দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে। দারুণ! ওর গালে টোকা দিয়ে বলল মহেশ।

—আঃ কি যে কর। ভুরু কোঁচকালো বিমলা।

স্বামী-স্ত্রী হাঁটতে হাঁটতে বাজার পর্যন্ত এলো। শনিবার। কালিম্পঙ বাজার ব্যস্ত। এদিকে ওদিকে সর্বত্র মানুষের ভিড়।

—কোথায় যাবে ? মেন রোডের প্রচণ্ড ভিড় দেখে বিরক্ত মুখে বলে বিমলা।

—চলো, নভেলটি হয়ে, নিচে 'নয় মাইল' পর্যন্ত বেড়িয়ে আসি। বিমলার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রস্তাব দিল মহেশ। মানুষের ভিড় যেন সহ্য করতে পারছে না বিমলা। সে চুপচাপ স্বামীর পেছনে-পেছনে হাঁটতে থাকে।

—বাদাম খাবে ? নভেলটির কাছা-কাছি একটা দোকানের কাছে এসে বলে মহেশ।

—উঁহু···না। সংক্ষেপে উত্তর দেয় বিমলা। দুজনে নিশ্চুপ হাঁটতে থাকে। রাস্তা দিয়ে লোকজন আসছে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে গাড়ি চলাচল করছে তীব্র গতিতে। কখনো উপরে কখনো বা নীচে।

দূরে সিকিমের পাহাড় দেখা যাচ্ছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্য চোখে পড়ছে। ওদিকে পেশক্ দার্জিলিঙের রাস্তা সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারেও নজরে আসে। সূর্য ধীরে ধীরে পাহাড়ের অন্য ধারে আত্মগোপন করছে। নভেলটি পার হয়ে এখন মহেশ ও বিমলা ধর্মোদয়ের কাছে এসে পৌছেছে।

—বিমলা! একটা কথা জিজ্ঞেস করতে খুব ইচ্ছে করছে। হঠাৎ বলে মহেশ।

—কি কথা ?

—বেশ কিছুদিন তোমায় কেমন উদাস দেখছি। এ কি আমার চোখের ভুল ?

—তোমার হয়ত তাই মনে হয়। কৈ! আমি তো উদাস নই। একনজর নিজের স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল বিমলা।

—তা নয়, কথায় আছে, মুখ হচ্ছে মনের আয়না। আমায় মিথ্যে বোল না, তোমার হৃদয়ে এমন কোন কথা আছে কি, যা তোমায় বিচলিত, উদভ্রান্ত করে তুলছে ? হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে যায় মহেশ। এক দৃষ্টে তাকিয়ে দেখে নিজের স্ত্রীর মুখের দিকে। তার মনের ভাব জানার চেষ্টা করে।

বিমলার মুখভাবে সূক্ষ্ম পরিবর্তনও দেখা যায় না। কিন্তু তার দ্রুত-গতিতে হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পেতে থাকে। কণ্ঠ শুকিয়ে আসে। বিমলা কিছু না বলে বাদামের খোসা ছাড়িয়ে মুখে দিতে থাকে।

—আমাকেও যা বলতে পারো না, সে এমন কি কথা ? মনের বাঘ মানুষকে চিবিয়ে খায়·····তাই ভয় বিমলা। আমি কোন সাহায্য করতে পারি কি ? পত্নীর মৌনতা ভঙ্গের প্রয়াসে পুনরায় বলে মহেশ।

—না, না, এ তোমার ভুল ধারণা। আমার মনে কোন রকম সমস্যা নেই। এই তোমায় ছুঁয়ে বলছি। এতক্ষণ যে মুখ বিষণ্ন বিমর্ষ ছিল, হঠাৎই পূর্ণচন্দ্রের মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ওকে দেখে দ্বিধায় পড়ে মহেশ। তবু ওর মনে এতক্ষণ যে আশঙ্কা পুঞ্জিভূত হয়েছিল স্ত্রীর মুখভাব দেখে তা অনেকটা হাল্কা হয়ে পড়ে।

—নারী একটা বিরাট প্রশ্ন। কেউ এর উত্তর দিতে পারে না। এ কথা বলে হাসল মহেশ। বিমলাও তার হাসিতে যোগ দিল।

—এ কথার মানে ? হাসতে হাসতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে বিমলা। নিজের স্ত্রীর এই আকস্মিক পরিবর্তনে মহেশ হতবাক হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর মহেশ বলে—তোমার হৃদয়ের জ্বালা জুড়োবার জন্য তুমি একটা মুখোশ পরে থাকো সব সময়। এটাই হয়ত তোমার উদাসীনতার

কারণ। কারণ মানুষ নিজের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি গোপন করার জন্যে অনেক সময় ছদ্ম-গাম্ভীর্যের আবরণ ব্যবহার করে।

—কোন কারণ ছাড়াও তো অনেক সময় অনেক কিছু ঘটতে পারে। তাই না? কারণ অনেক কিছুই তো অনেক সময় ঘটে থাকে যার কোন মানে নেই। তাই বলছি, আমার এই উদাসীনতারও কোন কারণ নেই। হাসতে হাসতেই বলে বিমলা।

—তোমার অভিনয় আমিও বুঝতে পারি বিমলা। মহেশ আরো গম্ভীর হয়ে বলে। কলেজে পড়ার সময় আমিও মনোবিজ্ঞান পড়েছি। কোন কথায় তুমি আঘাত পেয়েছ—তোমার মধ্যে একটা অস্থিরতা রয়েছে, আমি সেটা জানতে চাই।

একদৃষ্টে নিজের স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকে বিমলা। হয়ত ওর মনের কথা ধরতে পেরেছে ওর স্বামী, এই ভয়ে থির থির কাঁপে ওর মন।

—তোমার মনোবিজ্ঞান তোমার সঙ্গেই থাক। আমি তো বলেই দিলাম, কোন ব্যাপারে আমার চিন্তা নেই। তুমি কি জানতে চাইছ বুঝছি না। এবার তার কণ্ঠস্বরে ক্রোধ ছুঁয়ে যায়।

—মহেশ জানে সত্য সব সময় জ্বালিয়ে যাবে। বিমলার মনেও এমন কোন দ্বন্দ্ব রয়েছে যা নিরন্তর আগুন জ্বালাচ্ছে। কিন্তু সেই দ্বন্দ্ব দূর করার উপায় কি? তার বিগত জীবনের কোন প্রেমিকের চিন্তা? নাকি বর্তমান দাম্পত্য জীবনের অসন্তুষ্টি? এই সমস্ত প্রশ্নের জ্বালায় মহেশ নিজেই জর্জরিত।

—এবার ফেরা যাক। এটুকু বলেই পেছন ফিরে উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করে মহেশ। বিমলাও কোন কথা না বলে হাঁটতে থাকে। সমস্ত পথ স্বামী-স্ত্রী মৌনতা অবলম্বন করে নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকে।

বাড়ির কাছে এসে অনেকটা সহজ হয়ে মহেশ বলে—বিমলা, পতিপত্নী, দুই শরীর এক প্রাণ নয়?

মহেশের অদ্ভুত প্রশ্নে বিমলার মুখে মেঘ ঘনায়।

—হ্যা—কিন্তু—কেন? স্বামীর কথার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে প্রশ্ন রাখে বিমলা।

—তাই যদি হল, তাহলে আজ পর্যন্ত আমরা পরস্পরের কাছে অপরিচিত

কেন ? বিবাহের আট বছর পরেও মনে হয় যেন আমরা স্বামী-স্ত্রী নই। রহস্যময় ভাবে শেষ করে মহেশ।

—কেন ? হঠাৎ চলা বন্ধ করে স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে বিমলা।

—কারণ হচ্ছে·· তুমি তোমার ও হৃদয় যন্ত্রণার কথা গোপন করে রেখেছ আমার কাছ থেকে। যদি আমাদের পরস্পরের মধ্যে সত্যিকার বিশ্বাস থাকতো, তাহলে তোমার সমস্যা হতে আমাকে বঞ্চিত রাখতে না।

স্বামীর এই ধরনের উত্তর শুনে বিমলা হতবাক। তার অজ্ঞাতসারেই দু চোখ বেয়ে অশ্রুবন্যা নামে।

—তোমার ভুল ধারণা—আমার মনে গোপন করার মত কোন কথা নেই। এই কথাটুকু বলে দ্রুত এগিয়ে যায় বিমলা। মনের মধ্যে যেন আসন্ন ঝড়ের সংকেত। মহেশ নির্নিমেষ চোখে নিজের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ পর মহেশ নিজের ঘরে ঢোকে। বিমলা খাটের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে উপর দিকে তাকিয়ে ছিল। ঘরের মধ্যে অসীম শূন্যতা। বারবার মহেশ তার স্ত্রীর দিকে দেখে। কিন্তু এবার বিমলা নিজের ভাবনায় মত্ত থেকে একদৃষ্টে দেয়ালে টাঙ্গানো ক্যালেণ্ডারের একটি সুন্দর শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মৌন মহেশও ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ক্যালেণ্ডারের সেই ছবির দিকে তাকায়। ছবি দেখতে দেখতে মহেশের মস্তিষ্কে যেন ভয়ঙ্কর এক বিস্ফোরণ ঘটে। তৃষ্ণা—তৃষ্ণা—তৃষ্ণা।

নারী শুধু প্রেমেই সুখী হয় না। প্রেমের চেয়েও বড় অন্য কিছু চায় সে। মমতা, স্নেহ, সেবা এবং—এবং—এবং গৃহস্থ জীবনের প্রেমের ফলস্বরূপ ওর মধ্যে থাকে মাতৃত্বের প্রচণ্ড ক্ষুধা।

এতক্ষণে যেন রহস্যভেদ হয়। মহেশের মন ছটফট করে। নিজেই আত্মগ্লানিতে জ্বলতে থাকে। চোখের সামনে সুন্দর শিশুর ছবি ওকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধু হাসছে···হাসছে।

[প্রকাশ রাণা : দার্জিলিঙ জেলার কালিম্পঙে ১৯৫০ সালে জন্ম। কথাশিল্পীরূপে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন বর্তমানে। অনেকগুলি ছোটগল্প সংকলন ও উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—অভিশাপ, মুণ্টু ভিত্র, মেরো দেবতা, চিসোস্পর্শ। সম্পাদনা করেছেন—চৌরঙ্গী, সক্কে ছ।]

পরমান্ন

—ইন্দ্রবাহাদুর রাই

সেই সময় আমি সেই ঘটনাটি বুঝে উঠতে পারিনি, তার কোন অর্থ আছে বলে ভাবিনি। এখন এতদিন পরে আমার মনে পড়ছে।



তিস্তার প্রচণ্ড গর্জনের বর্ণনা আমি বিভিন্ন উপন্যাসে, গল্পে পড়েছি, নিজেও লিখেছি একাধিকবার কিন্তু এমনভাবে তিস্তার গর্জন শোনার সুযোগ এর আগে আমার হয়নি। মধ্যদিন ও মধ্যরাতে তিস্তার আর্তনাদের কথা শুনেছি, যারা বর্ষায় ও শীতে তিস্তার দুপারে কাজ করতে যায় তাদের কাছে। কিন্তু কালিম্পং বা গ্যাংটক যাতায়াতের পথে ব্যস্ততায় গাড়ি থেকে এক মুহূর্তের জন্যে নেমে পুলের উপরে উঠেছি। ওপর থেকে দেখেছি। তিস্তার কল্লোল শোনার তৃষ্ণা অতৃপ্ত রয়ে গেছে। সবুজ, নীল জলরাশি প্রচণ্ড বেগে বয়ে চলেছে, জলের হাওয়ায় দুপাশের গাছপালা কাঁপছে। এই অপরূপ দৃশ্য কত স্মৃতি জাগায়।

গ্যাংটক হতে ফেরার পথে সেই দিন আমি তিস্তার ধারে একরাত কাটিয়েছিলাম।

ডাকবাংলোর ঘরগুলি মেরামত করা হচ্ছে। আমাকে যে ঘরটি দেওয়া হয়েছে সেটির সবেমাত্র কলি ফেরান হয়েছে। চুনের গন্ধে অস্বস্তি হচ্ছে এবং ঘরটি খুব বেশি সাদা মনে হচ্ছে। পাশের একটি ঘরে ডাকবাংলো মেরামত করার কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, রঙ করার লোক ও কুলিদের সাময়িক আস্তানা হয়েছে। তারাই আমার এই গল্পের নায়ক।

আজ তাদের উৎসবের দিন। একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিন। একসঙ্গে কাজ করার পর শেষ দিনে এরা উৎসব করে। ওরা সবাই একসঙ্গে রয়েছে, কথাবার্তা বলছে। টুকরো টুকরো কথা কানে আসছে। তারা কিছু একটা

রান্না করছে, এবং কথাবার্তা সেই প্রসঙ্গেই। হ্যাঁ, এবার বোঝা গেল ওরা পায়েস রাঁধছে।

খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আলোচনা আমার ভালো লাগে না। তবু নিরুপায়, শুয়ে রইলাম। দরজার বাইরে মধ্যদিন পার হবার অনুজ্জ্বল আলো। শুয়ে শুয়ে নানা কথা ভাবছি। কিন্তু পাশের ঘর থেকে ওদের কথাবার্তা কানে আসায় চিন্তাসূত্র ছিন্ন হচ্ছে।

—যদি পায়েস খেতেই হয়, তাহলে এক পোয়া চালের সঙ্গে দুই সের দুধ দিতে হবে। মনে হল একজন জ্ঞানবৃদ্ধ এই মন্তব্য করছে।

—আমাদের যা চাল রয়েছে তাতে দশ সের দুধ লাগবে। কত দিয়েছ?

—কত আর! চার সের দিয়েছি।

—তিস্তার মত জায়গায় মাত্র চার সের দুধ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! সেই কণ্ঠস্বরে একরাশ বিরক্তি ও ক্রোধ।

—চার সের দুধের পায়েস! এই খ্যাখো। যেন সবাইকে দেখাচ্ছে। এমনভাবে বলল আর একজন।

—সত্যি যদি পায়েস খেতে হয় তাহলে অনেক জিনিস লাগে। মনে হল আর একজন বয়স্ক লোক এই মন্তব্য করল।

—প্রথম কথা, যে চাল এনেছ তাতে পায়েস হয় না। দুনিয়া চাল আনা দরকার ছিল। সরু, লম্বা, দেখতে সুন্দর—

—সাধারণ আলোচালই কেনা গেল না, তার ওপর দুনিয়া! গম্ভীর, রাগী এক যুবকের কণ্ঠস্বর।

—নিশ্চয় চালে ঠকিয়েছে।

—যেমন আমাদের ঠকিয়েছে, তেমনি জব্দ হবে বেটা। ফোড়ন কাটে কে একজন!

—যদি জিনিস পাওয়া যায় এবং ঠিকমত পায়েস খেতে হয় তাহলে—সেই অভিজ্ঞ বয়স্ক কণ্ঠস্বর—পুরোন দুনিয়া চাল, কালো দুনিয়া হলে আরও ভালো সুবাস ছড়াবে। দশ-বারো সের খাঁটি দুধে রাঁধতে হবে। জল মেশানো দুধ হলে পনের সের লাগবে। পাঁচ সের জল শুকোতে শুকোতে চাল তো আঠার মত কাদা কাদা হয়ে যাবে। আবার পাতলা দুধের পায়েস হলে তলায় লেগে যায়। শেষে পুরোটা পোড়া গন্ধ লাগে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ সবজান্তা আপনি! রোজ রোজই তো পায়েস খান! কে যেন টিপ্পনী কাটল।

কিছুক্ষণ পর আর একটি কণ্ঠস্বর কানে এল—শুধু খাঁটি দুধ হলেই ভাল পায়েস হয় না। তার জন্যে চাই পেস্তা, কিসমিস, কাঠবাদাম, দারচিনি, নারকেল, তেজপাতা। আর খুব অল্প আঁচে রাঁধতে হবে। কিসমিস পরে দিতে হবে। আগে দিলে দুধ কেটে যাবে।

—ঐসব দিয়ে কি হয়? একটি উৎসুক লোভার্ত কণ্ঠস্বর কানে এল।

—স্বাদের জন্যে। গন্ধের জন্যে। শক্তি বর্ধনের জন্যে। একসঙ্গে তিন-চার জন উত্তর দিল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ মনকে বোঝাও। স্বপ্নে ওই সব জিনিস খুঁজে এনে পায়েসে মিশিয়ে দাও। সব পাবে। দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল একটি ধাতবকণ্ঠ।

—সেইভাবে যদি এখানে পায়েস রান্না করা যায়, তাহলে এই যে রাস্তা দিয়ে লোক যাচ্ছে, তার নাকেও গন্ধ যাবে। বলল একজন।

আমি এবার তাদের পায়েসের গন্ধের জন্যে মনোযোগী হলাম। কিন্তু নাঃ এত কাছ থেকেও কোন গন্ধ পেলাম না।

—এমন পায়েস যে এখানে বসেই আমরা গন্ধ পাচ্ছি না। বলল একজন।

—এর চেয়ে ভালো পায়েস খাবার সাধ হলে তুমি নিজেই পয়সা বার করতে চাইবে না।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার শোনা গেল।—চুরি করে হোক, উপার্জন করে হোক, অপরের ঋণ শোধ না করে হোক, যে কোন ভাবেই হোক, খেয়ে তো বাঁচতে হবে। বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।

এবার সবাই চুপ। কোন শব্দ নেই। আমিও এই নৈঃশব্দের সঙ্গী। চুপচাপ শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছি। এবার উঠে পড়লাম। ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলাম। আমার উপস্থিতি জানতে পেরে ওদের মধ্যে নিশ্চয় প্রতিক্রিয়া হল। বড় পাথর পড়ে যেমন জলের গতিপথ অন্য খাতে বইয়ে দেয়, ওদের আলোচনার ধারাও পালটে গেল। একটু পরে আবার কানে এল ওদের সংলাপ।

—সব জিনিসপত্র যোগাড় করলেই হবে না, আসল কথা হচ্ছে রান্না। ভালো রাঁধুনি চাই।

—যখন তখন পায়েস খেলেই হবে না। সময়মত খাওয়া প্রয়োজন। বিচার করে দেখতে হবে, খাওয়া উচিত হবে কি হবে না।

—তাহলে তো পায়েস খাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার! একেবারে অসম্ভব!

আমার খুব হাসি পাচ্ছে। বাইরে তাকালাম। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। গাছগুলো নড়ছে না। স্থির দাঁড়িয়ে।

—নাড়ো, নাড়ো, এক্ষুণি তলায় লেগে যাবে।

—মনে হচ্ছে, হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ হয়ে গেছে।

—যা দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ হয়েছে। উনুন থেকে পাত্র নামাবার শব্দ হল। সবাই যেন একটু দূরে সরে গেল। দু'একজন বসার জায়গা বানাচ্ছে মনে হল।

এবার খেতে খেতে একজন বলল—কেমন যেন গন্ধ গন্ধ লাগছে।

—হ্যাঁ, এই রকমই লাগে।

হ্যাঁ, পোড়া কাঠের গন্ধ। সেই তখন থেকেই ভাবছি আমি।

—চিনি হয়নি। একজন একথা বলে উঠে গেল। হয়ত চিনি এনে ঢেলে দিয়ে খেতে বসল।

—পায়েস যদি খেতেই হয়, সেই অভিজ্ঞ কণ্ঠস্বর—চিনি নয়, গুড় দিতে হবে। দারুণ রঙ হয়।

—কালো গুড় নয় কিন্তু। সাদা সাদা খেজুরগুড়।

—বাঃ কালো গুড় দিলে কি খাওয়া যায়? ওয়াক...

—ইস কত আর খাওয়ার গল্প করবি? কোনদিন কি পায়েস খেয়েছিস যে তার অভিজ্ঞতার কথা বলবি? আমার তো সেই এককথা শুনে ঘেন্না ধরে গেল।

বুঝলাম, এই কথাগুলি আমাকে শুনিয়ে বলা।

আবার ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল খাওয়ায়।

—চিনি দেওয়া মিষ্টি দুধের মত লাগছে। গম্ভীর গলায় কে যেন বলল। সবাই হো হো করে হেসে উঠল। যে রান্না করেছে সে একটু বেশী হাসল, মনে হল। তাকে ঐভাবে হাসতে দেখে, থামতে বলে অন্যরা আরও বেশি হাসল।

আজ চার বছর পর আমার সেদিনকার ঘটনা মনে পড়ল। তার অর্থও যেন বুঝতে পারলাম। তাদের রান্নাকরা পায়েস আমাদের জীবনের মত। জীবনকে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, কি কি কখন প্রয়োগ করতে হবে এমন অনেক আদর্শ আমাদের মনের মধ্যে রয়েছে কিন্তু আমাদের এই জীবন তাদের রান্নাকরা সেই পায়েসের মত। যা যথার্থ পায়েস হয়ে ওঠেনি।

জীবন যেন তিস্তার মত চিরপ্রবহমান এক উদ্দাম, উচ্ছল পাহাড়ী ঝর্ণা।

[ইন্দ্রবাহাদুর রাই : দার্জিলিঙের টার্নবুল স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। অতঃপর সেন্ট যোশেপস কলেজে অধ্যাপনা করেন। প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজীতে এম. এ. পাশ করেছেন। চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। এখন সাহিত্যকর্মে ব্যাপৃত। ঈশ্বর বল্লভ ও বৈরাগী কাঁইলার সঙ্গে নেপালী কবিতায় আয়ামিক ধারার প্রবর্তক। তিনি কথাশিল্পী, প্রবন্ধকার, সমালোচক। ১৯৭৫ সালে নেপালী সাহিত্যে প্রথম আকাদেমী পুরস্কার পান।]

পতিত ব্রাহ্মণ

—রূপনারায়ণ সিন্‌হা

খুব জরুরী প্রয়োজনে সেদিন আমার রামেছাপ পৌছতেই হবে। শ্রাবণ মাস, বৃষ্টিবাদলার দিন। ঝর্ণা নালা জলে পরিপূর্ণ। তবু দুর্গানাম জপ করে সকালেই আমি ওখালডুঙ্গা হতে রওনা হলাম।



রামেছাপ পৌছতে আর মাইল দশেক বাকি। সামনের গ্রাম এক মাইলের মধ্যে। রিমঝিম বৃষ্টি দেখতে দেখতে মুষলধারায় শুরু হল। সঙ্গে প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া। চারিদিকে দারুণ শব্দ। পাহাড়ের জংলি রাস্তায় অন্ধকার নামল।

বিপদে পড়ে কোথাও মাথা গোঁজবার ঠাঁই পাই কিনা দেখতে লাগলাম।

কাছেই বজ্রপাত হল। একটি বড় গাছ শব্দ করে পড়ে গেল। চোখ বুঁজে কানে আঙ্গুল দিয়ে একটা পিছল পাথরে বসে পড়লাম। বৃষ্টি আরো জোরে শুরু হল।

একটু পরে আমি উঠলাম। কোথাও একটু আশ্রয় নেওয়া দরকার মনে করে আমি বিশ-পঁচিশ হাত এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল একজন লোক ধীরে সুস্থে এগিয়ে আসছে। এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তার শরীরের জামাকাপড় সম্পূর্ণ ভিজে। তার মাথা ও শরীর দিয়ে জলের ধারা বইছে।

অথচ তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। কোন ব্যস্ততা নেই। ধীরে সুস্থে হাঁটছে, যেন সে বেড়াতে বেরিয়েছে। অথচ আমি নিজে অস্বস্তি বোধ করছি। আমার মাথা কাঁধ বেয়ে জল নামছে শরীরে। পিঠ সম্পূর্ণ ভিজে।

আমার কাছাকাছি এসে আমার দিকে তাকাল। কিন্তু কোন কথা না বলে সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

আমি এবার করুণ কণ্ঠে বললাম—দাদা, এখানে বিশ্রাম নেবার মত কোন জায়গা পাওয়া যাবে কি? যদি জানা থাকে, অনুগ্রহ করে আমায় বলুন।

—থাকবার জায়গা? থাকবার জায়গার কি দরকার? অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

সঙ্গে সঙ্গে আমি উত্তর দিলাম—ঝড় ও জলের থেকে বাঁচবার জন্যে।

—এই ঝড় জল থেকে বাঁচবার জন্যে? তাহলে তো নিশ্চয় থাকবার জায়গার ব্যবস্থা করতে হয়। চলো আমার সঙ্গে। কাছেই আমার বাড়ি।

আমাকে সঙ্গে করে, লোকটি যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই ফিরে চলল। আমি কিছুটা অপ্রতিভ হয়েই বললাম—আপনি কোনও জরুরী কাজে কোথাও যাচ্ছিলেন বোধহয়।

—নাঃ আমি এমনিই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। শ্রাবণের ঝড় বাদলের সময় আমি ঘরের মধ্যে থাকতে পারি না। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হলেও ঝর্ণার ধারে না গিয়ে থাকতে পারি না।

তার এই বক্তব্যে আমি হতচকিত। কি আর উত্তর দেব? আমার মাথায় কিছু আসছে না। নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা দুতিনটি ছোট কুঁড়ে ঘরের সামনে এসে পৌঁছলাম।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমায় জিজ্ঞেস করল—আপনি কোন্ বর্ণের? ছেত্রী?

—হ্যাঁ, বলে আমি মাথা নাড়লাম।

—আমি ব্রাহ্মণ। যাই হোক না কেন, একদিন আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম। আজ অবিশ্যি সকলে আমায় বলে পতিত ব্রাহ্মণ। সমাজ এবং আত্মীয় স্বজন আমায় একঘরে করে দিয়েছে। আমার মত পতিত ব্রাহ্মণের ঘরে আপনি থাকবেন? দরজা পার হয়ে ভিতরে ঢুকল সে।

আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঝোড়ো হাওয়া আরো বাড়ল। প্রকৃতির প্রকোপ শতগুণ বৃদ্ধি পেল।

ভিতরে লোহার উনুনে দাউ দাউ কাঠ জ্বলছে। ভিজে কাপড় বদল করে একটা ধুতি দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে আমার পথপ্রদর্শক বাইরে এল।

আবার সেই এক প্রশ্ন—আমার ঘরের ভিতরে কি আপনি আসবেন? যদি ভিতরে আসেন দেখবেন উনুনের কাছে ধুতি, চাদর, গামছা, রুমাল

রয়েছে। ভিজে কাপড় আগুনে শুকোতে ইচ্ছে হলে শুকোতে পারেন। দাউ দাউ আগুন জ্বলছে।

এটুকু বলে সে পাশের ঘরে ঢুকল। কাদাভরা পা জলে ধুয়ে আমি ভিতরে ঢুকলাম। ভিজে কাপড় বদল করে ধুতি পরলাম। নিঃশব্দে এসে সে আমার পাশে আগুনের ধারে বসল। চাদর জড়িয়ে আমিও আগুনের ধারে কম্বলের ওপর বসেছি। প্রদীপের আলোয় ঘরের মালিককে ভালো করে দেখলাম।

চব্বিশ পঁচিশ বছরের সুদর্শন যুবক, উন্নত নাক, উজ্জ্বল দুটি চোখ। বলিষ্ঠ গঠন। ডানহাতে একটি বই। মাথা কাত করে একদৃষ্টে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে।

কিছুক্ষণ পরে আমি আস্তে জিজ্ঞেস করলাম—আজ আমি রামেছাপ যেতে পারবো তো ?

অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল সে—রামেছাপ ? কেন পৌছতে পারবেন না ? কতই বা দূর হবে ?

আমি বললাম—ঝড়বৃষ্টি থামবে কি- না !

ধীরে আমার দিকে মাথা ঘুরিয়ে বলল সে—বৃষ্টি ? বৃষ্টির তো নিশ্চয় থামা উচিত। কিন্তু বৃষ্টির জন্যে ঝর্ণাগুলো পাগল হয়ে গিয়েছে। পাগল ঝর্ণার চেহারা কখনো দেখেছেন কি ? এ ছেলেখেলা নয়, যথার্থ ই উন্মাদ-অবস্থা। মনে হয় যেন সমস্ত সংসার গিলে খাবে।

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

—আমি দেখেছি। এইভাবে একটি ঝর্ণা পাগল হওয়ায় আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম।

তার কথা শুনে আমি বিস্মিত, হতচকিত। কি ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলল—আমি একা হয়ে গেলাম। আমার দাদা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। আজ আমি পতিত। সবাই আমায় 'পতিত বাউন' বলে।

আমি বললাম—কিন্তু ঝর্ণা পাগল হয়ে গেছে বলাতে আপনাকে কেন একঘরে করল ? এ আবার কি রকম কথা !

—আমার কথা আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না ? তবে শুনুন আমার কাহিনী।

[দুই]

আমাদের বাবা উমাপ্রসাদ তিমিলসিবা আচার্য গ্রামের মান্যগণ্য পুরোহিত ছিলেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণরূপে বাবাকে সকলেই শ্রদ্ধা করত। নিজের গ্রাম ছাড়াও অন্যান্য গ্রামে বাবার যজমানী ছিল। বিবাহ, ব্রতাচার, ক্রিয়াকর্ম যে কোন ব্যাপারে তিমিলসিবা আচার্যের ডাক পড়ত।

আমরা দুই ভাই। দাদা আমার চাইতে এগারো মাসের বড়। একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছি আমরা। দুজনের একই সঙ্গে উপবীত হল। এই দিনটিতে বাবার আনন্দ ও অহঙ্কার দেখার মত। ষোলজন ব্রাহ্মণ ও গ্রামের সমস্ত শিশুদের ভোজন করানো হল। সারদিন বাড়িতে সানাই, ঝ্যালী, কর্ণাল, মৃদঙ্গ বাজনা বাজল। তিমিলসিবার দুই ছেলের উপবীত দেখার জন্যে যথেষ্ট ভিড় হয়েছিল।

কাজের শেষে সবাই চলে গেল। ব্রাহ্মণ বিদায় পর্ব শেষ হল। এরপর বাবা, আমাকে ও দাদাকে আশীর্বাদ করে বললেন—বাবা আমার, আজ-থেকে তোমরা দুজন যথার্থ অর্থে দ্বিজ হলে। কুলের সম্মান ও ধর্ম আজ হতে তোমাদের হাতে সমর্পণ করলাম। তিমিলসিবা সম্প্রদায়ের কদর রাজসভা পর্যন্ত ছিল। সময়ের ফেরে এখন তোমাদের বাবার মাত্র তিন চারটি গ্রামে যজমানী রয়েছে। তবুও তোমাদের বাবাকে সকলে মান্য করেন। কারণ আমি কখনো ধর্ম ও নিষ্ঠা ত্যাগ করিনি। তিমিলসিবা ঘরাণার নাম তোমাদেরও সেইভাবে রক্ষা করতে হবে। যে কোন সঙ্কট আসুক না কেন, এমন কি জীবন যদি যায় তবুও ধর্ম ও নিষ্ঠা ত্যাগ কোরো না। পবিত্র যজ্ঞোপবীতের মর্যাদা রক্ষা কোরো।

উপবীত স্পর্শ করে মনে মনে বললাম, তোমার আদেশ পালন করব।

দুই বছর পর আমাকে ও দাদাকে বাবা বারাণসী পাঠালেন পড়বার জন্তে। বারাণসীর মত বড় শহরে বিদেশী ও বিজাতীয়দের সঙ্গে একসঙ্গে ওঠাবসা করতে হয়। প্রতি মুহূর্তে ধর্ম ও আচার-ভঙ্গের ভয় থাকে।

মাঝে মাঝে দাদা বলেন—বাড়ির মত অত শুদ্ধ পবিত্র ভাবে কি বিদেশে থাকা যায়? ভুলচুক করে দোষ করলে পাপ হয় না।

কিন্তু তিন বছর বারাণসী বাসকালে আমি আচার ধর্ম ও নিষ্ঠাকে এমন ভাবে রক্ষা করেছি, যেমন ভাবে কৃপণ তার ধনরক্ষা করে।

বারাণসী হতে ফেরার বছর মা পরলোক গমন করেন। বৃদ্ধবয়সে সেই

শোক সহ্য করার ক্ষমতা বাবার ছিল না। আমাকে ও দাদাকে যজমানীর ভার দিয়ে বাবা ঘরের এককোণে নিঃশব্দে সময় কাটানো শুরু করেন। আজ থেকে চার বছর আগে বাবা দেহত্যাগ করেছেন।

যজমানী করে পেট ভরানো ছাড়াও কিছু জমিজমা বাড়ানো দরকার বলে দুই ভাই পরামর্শ করলাম। বাবার দেহ ত্যাগের আগেই সব যজমানী দাদা নিয়ে নিয়েছেন। আমি ব্যবসার দিকটা দেখাশোনা করতে থাকলাম।

যজমানীর চাইতে ব্যবসায় মারফৎ দশগুণ লাভ হতে থাকে। ঘরে কিছু পুঁজি জমা হল। বাবার পরলোক গমনের দেড় বছর পর দাদা বিয়ে করতে রাজি হলেন। বৌদি বেশ বনেদি বাড়ির মেয়ে। সকলের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করেন। আমার সঙ্গে মায়ের মত আচরণ করেন। তিমিলসিবা পরিবারের মর্যাদা বাড়ালেন বৌদি।

ব্যবসায়ের প্রয়োজনে আমাকে নিত্য নতুন জায়গায় যাতায়াত করতে হত। নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়। পশ্চিমে নুয়াকোট ও পূর্বে ইলাম পর্যন্ত যাতায়াত করতাম। রাত বিরেতে, দেশ-বিদেশে যখন তখন ঘোরাঘুরি করার জন্যে আমার থাকা খাওয়ার প্রচণ্ড অসুবিধে হতে থাকলো। তবু আমি আমার ধর্ম, আচার নিষ্ঠা হতে তিলমাত্র বিচ্যুত হইনি।

[তিন]

বাইরে ঝড় বৃষ্টি কিছুটা কমেছে। ডানহাতে ধরা বইটার পাতা অন্যমনস্ক ভাবে উলটিয়ে আগুনের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল।

ধীরে সেখান থেকে উঠে পাশের ঘরে গেল। হাতের বইটা রেখে যাওয়াতে আমি তুলে নিয়ে দেখলাম। ভানুভক্তের রামায়ণ।

একরাশ কাঠ হাতে নিয়ে ফিরে এল। আগুনে কাঠ গুঁজে দিতে দিতে বলল—রামেছাপ পৌছতে অনেক সময় লাগবে। বৃষ্টিও চট করে থামবে বলে মনে হচ্ছে না। আজ না হয় পাশের গ্রামে রাত কাটালেন।

কিছু বলার অবকাশ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম—তার জন্যে আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। সামনের গ্রামে আমার অনেক পরিচিত লোকজন আছেন।

—আপনার জামাকাপড় প্রায় শুকিয়ে গেছে। বলল লোকটি। যতক্ষণ না শুকোয় আমার গল্প শোনাই। না, থাকবে?

আমি হ্যাঁ, না বলার আগেই শুরু করল—সেদিন এমনি শ্রাবণ মাস। সারারাত মুষলধারায় বৃষ্টি হয়েছে। পাহাড়ি ঝর্ণা, নদী জলে টই-টম্বুর হয়ে প্রচণ্ড গর্জনে বয়ে চলেছে। তারা যেন সমুদ্রের সঙ্গে মিলনের জন্যে অস্থির হয়ে প্রাণপণে ছুটছে। কালো মেঘ আকাশকে আরো কালো করে তুলেছে।

পুরোনো চাকর সঙ্গে নিয়ে আমি বাড়ি ফিরছি। গ্রামের কাছাকাছি ঝর্ণার ধারে আমরা এসে গেছি, হঠাৎ প্রচণ্ড বাতাস ও বৃষ্টি শুরু হল। এক পা এগুনো যায় না। একটি গাছের নিচে আমরা আশ্রয় নিলাম।

ঝর্ণার ধারে কাছে তিন চারজন কুমোর, চার পাঁচজন ব্যবসায়ী এবং আমাদের গ্রামের দমিনী বুড়ি আলাদা-আলাদা ভাবে বিশ্রাম নিচ্ছিল। প্রায় দুইঘণ্টা পরে সেই প্রচণ্ড বর্ষা ও বাতাস কমল।

কিন্তু ঝর্ণা পার হব কিভাবে? সেই প্রচণ্ড স্রোতে পা রাখাই কঠিন। বৃষ্টি থামবার পরক্ষণেই সকলের মনেই একই প্রশ্ন দেখা দিল।

একজন ব্যবসায়ী আমায় দেখে বলল—ছোটকর্তাও এই বিপদে পড়েছ? এখন কি উপায় করা যায়?

আমি বললাম—উপায় আর কি আছে। দুজন শক্তিশালী যুবক বড় বড় গাছের ডাল নিয়ে দু দিকে দাঁড়াবে, আমরা হাতে হাত মিলিয়ে পার হয়ে যাব।

আমার এই প্রস্তাবে সকলে রাজি হল। কুকুরি বার করে গাছের ডাল কেটে তৈরি হল কয়েকজন। হঠাৎ দমিনী বুড়ির কণ্ঠস্বর কানে এল—ভাই ছোটকর্তা, তোমরা সবাই তো পার হয়ে যাবে, কিন্তু আমার কি উপায় হবে? আমি কি ভাবে পার হব?

পেছন ফিরে দেখলাম।

গ্রামের দমিনী বুড়ি। বুড়ো বয়সে ছেলেমেয়ে সবাই মারা গিয়েছে। এখন বৃদ্ধ বৃদ্ধা মাত্র জীবিত। এদের দেখাশুনো করার কেউ নেই। কোন রকমে দুঃখ কষ্ট সহ্য করে বেঁচে আছে। যে কোন মুহূর্তে জীবনদীপ নির্বাপিত হতে পারে। তিথি পর্ব পুজো পার্বণে সারাবছর আমার বৌদি এই দরিদ্র দম্পতিকে নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন।

—যেমন করে হোক, আমার একটা ব্যবস্থা করে দাও। আধমরা বুড়োকে

বাড়িতে রেখে একটু ওযুধ আনতে গেছিলাম। এখন কিভাবে বাড়ি পৌছব? অসহায় বৃদ্ধার করুণ বিলাপ আর দীর্ঘশ্বাস মনকে ব্যথিত করে তুলল।

বুড়ি দমিনীর শরীরে চামড়া ও হাড়মাত্র রয়েছে। তার জীর্ণ শরীর থরথর কাঁপছে। কুঞ্চিত গালে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। তার এই অবস্থা দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল।

আমি বললাম—এসো ধুলের মা, তুমিও হাত ধরাধরি করে চলো।

আমার মুখ হতে এই শব্দটুকু বার হয়েছে মাত্র সঙ্গে সঙ্গে সকলে, এমন কি আমার চাকর পর্যন্ত একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—রামরাম, ছোট ঠাকুর-মশায়, এ আপনি কি বলছেন?

আমি বললাম—কেন? তাতে কি হয়েছে?

গ্রামের একজন ব্যবসায়ী বলল—অচ্ছুৎ-দমিনীর সঙ্গে হাত মেলাবো? এ কথা কেউ কি চিন্তাও করতে পারে? ব্রাহ্মণ হয়ে ছোঁয়াছুয়ির ভয় পর্যন্ত নেই আপনার?

তার এই কথা প্রত্যেকে, এমন কি আমার চাকর পর্যন্ত সমর্থন করল।

আমার উপবীত ধারণের দিন বাবা যে কথাগুলি বলেছিলেন, আমার মনে পড়ল। বাবা বলেছিলেন, যে কোন সঙ্কটকালে, এমন কি জীবন যদি যায়, তবুও ধর্ম ও নিষ্ঠা ত্যাগ কোরো না।

আমার ধর্ম হচ্ছে, সেই সময়, সেই অসহায়, অবলা অর্ধমৃত বৃদ্ধাকে তার রোগজর্জর স্বামীর কাছে পৌছে দেওয়া। কিন্তু তা করতে গেলে আমায় অচ্ছুৎ হতে হবে, একথা সত্যি। কিন্তু একজন সতী নারীকে, তা সে যত নিচু জাতিরই হোক স্পর্শ করে, মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর কাছে পৌছে দেবার জন্যে যদি আমার জাত যায়, যাক। আমার কুলধর্ম নষ্ট হবে? পিতৃপুরুষের সম্মান নষ্ট হবে?

আমি এবার একবার সেই পুরুষ, তথা জানোয়ারদের দিকে তাকালাম। সশ্রদ্ধচিত্তে একবার সেই সতী নারীর দিকে তাকালাম। ভক্তি সহকারে আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করলাম।

এবার একজন যুবকের হাত থেকে বড় ডাল কেড়ে নিলাম। বৃদ্ধা দমিনীকে পিঠে তুলে নিয়ে আমি ঝর্ণার ধারে গেলাম। তারপর সেই দুরন্ত ঝর্ণা পার হলাম।

গ্রামে এই খবর সঙ্গে সঙ্গে রটে গেল।

আমার পূজনীয় দাদা, মায়ের চেয়েও বেশি প্রিয় বৌদি এবং গ্রামের সকলে আমায় গালাগাল করল। তারা আমাকে জাতিচ্যুত করে দিল। আমি হলাম একঘরে, অচ্ছুৎ, পতিত ব্রাহ্মণ।

এইকথা বলে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আকাশের দিকে তাকালো। শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আমার মাথা আপনা হতে নুয়ে পড়ল। গদগদ কণ্ঠে আমি বললাম —ঠাকুরমশায়, আপনার মত পতিত ব্রাহ্মণের সংখ্যা ঈশ্বর যেন প্রতিদিন হাজারগুণ বাড়িয়ে দেন। তাহলে হয়ত পৃথিবী প্রতিটি মানুষের বাসযোগ্য হবে।

[রূপনারায়ণ সিন্‌হা (১৯০৭-১৯৫৫): দার্জিলিঙের প্রখ্যাত আইনজীবী রূপনারায়ণ ভারতীয় নেপালী সাহিত্যের অগ্রগণ্য কথাশিল্পী। ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের নিয়মিত পাঠক ছিলেন তিনি। অন্নপূর্ণা গল্পের মাধ্যমে তিনি নেপালী ছোটগল্পের ধারা বদল করেন ও সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপর একে একে উজ্জ্বল ছোটগল্প লিখে নেপালী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর ছোটগল্প সংকলন "কথা নবরত্ন" ও উপন্যাস "ভ্রমর" যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে।]

দিল্লীর ত্যুর্মাওয়ালা

—শিবকুমার রাই

হাওড়া স্টেশন থেকে সকাল প্রায় দশটায় ছাড়ল তুফান একস্প্রেস। সিগন্যাল পোস্ট পার হবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের গতি বাড়তে থাকে। ক্রমশঃ বর্ধমান, বরাকর, রাণীগঞ্জ, আসানসোল পার হয়ে এগিয়ে চলে ট্রেন। তুফান একস্প্রেস পূর্ণ গতিতে ছুটছে। সমতালে চাকার শব্দ ঘটঘট ঘটঘট ঘটঘট, ছন্দপতন ঘটাচ্ছে ইঞ্জিনের তীব্র হুইসেল।



কামরায় যাত্রী বিশেষ নেই। আট দশজন বাঙালী যাত্রী ছিল, বর্ধমানে নেমে গেছে। বাঙ্কে দুইজন মারোয়াড়ি যাত্রী ঘুমুচ্ছে। বাঘের গর্জনের মত তাদের নাসিকা ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

এই কামরার দুইজন যাত্রী কৃষ্ণবীর ও হরিভক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাদের প্রচণ্ড রেষারেষি। অবশেষে নিজেরা ক্লান্ত হয়ে মায়ের গহনা গাটি এবং বাবার লোহার বাক্স ভেঙ্গে দিল্লীর লালকেল্লা ও আগ্রার তাজমহল দেখতে যাচ্ছে। এতদিন বইয়ের মধ্যে ইতিহাস বন্দী ছিল তাই ওরা পাশ করতে পারেনি, এখন বাস্তব ইতিহাস দেখবে। কৃষ্ণবীর এর আগে বার দুয়েক বাবার পকেট মেরে কলকাতায় ঘুরে গেছে। তাই সে নিজেকে খুব চালাক চতুর, বুদ্ধিমান মনে করে। হরিভক্ত এই প্রথম বড় গাড়িতে চড়ল এবং এই দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর প্রথম দেখল।

কৃষ্ণবীর ও হরিভক্ত দু'জনেই ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে। নিজের বুদ্ধি সম্পর্কে কৃষ্ণবীরের যথেষ্ট অহঙ্কার। তাই সে বলতে থাকল—ত্থাখ, মাঠে ধানগাছ, সবুজ শিস্ কেমন লকলকিয়ে উঠেছে। ওই দিকে ত্থাখ, ওকে বলে পাটগাছ। আর এ দিকে ত্থাখ, কেমন চারিদিকে ঘিরে বাড়ির

মত করা হয়েছে। ছাদ দেওয়াল সব আছে, ভিতরে সূর্যের আলো ঢোকে না। ওর মধ্যে কি আছে জানো? পান। এভাবেই পান চাষ করা হয়।

হরিভক্ত আগে কখনো ধানক্ষেত, পাটগাছ, পান চাষ দেখেনি তাই সে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

একটি স্টেশনে ট্রেন থামল। হাতে একটি টিনের সুটকেস নিয়ে একটি লোক তাদের কামরায় উঠল ও পেছনের সিটে বসল। লোকটা কে এবং কোথায় যাবে সে সব বিষয়ে এদের কোন কৌতূহল ছিল না। কিন্তু ট্রেন চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ লোকটির বিচিত্র কণ্ঠস্বরে, দুজনেই চমকে উঠল। —তানসেন গোলী, তানসেন গোলী। লোকটি তার টিনের বাক্স খুলে ছোট ছোট কয়েকটি শিশি বার করল। তার মুখে অনর্গল কথা।

—তানসেন গোলী—পাঞ্জাবে তৈরী। মুখে একটি গুলি রাখলে সুগন্ধ বেরোবে, মেজাজ খুশ্ হবে। বড় একশিশি আট আনা ছোট শিশি চার আনা —নিন বাবুরা টেস্ট করুন।

কৃষ্ণবীর হাত পেতে দুটি গুলি নিয়ে মুখে পুরে দিল, দুটি দিল হরিভক্তকে।

এবার লোকটি অন্য একটি শিশি বার করে চীৎকার করে উঠল—টাইগার বাম, বেঙ্গল কেমিকেলের টাইগার বাম! মাথার যন্ত্রণা হলে, সর্দি কাশি হলে এই বাম ব্যবহার করুন সঙ্গে সঙ্গে ব্যাথা দূর হবে, সর্দি কাশি সারবে। মাত্র আট আনা। প্রত্যেক বাড়িতে একটি করে রাখা উচিত। লোকটি শিশি হাতে আঙ্গুলে বাম নিয়ে কৃষ্ণবীরের কপালে ঘসে দিতে লাগল। কৃষ্ণবীর বলল—হরি, তুমিও একটু মেখে ছাখ, কপাল কেমন ঠাণ্ডা হচ্ছে, কি আরাম। হরিভক্ত রাজি হল না।

এর মধ্যে একের পর এক ফেরিঅলা এলো গেল। কারো কাছে টর্চলাইট, কারো কাছে টুথপাউডার, চক্‌লেট ইত্যাদি।

ট্রেন পূর্ণ গতিতে এগিয়ে চলেছে, কৃষ্ণবীর কথা বলে চলেছে—শোন হরিভক্ত, বড় গাড়িতে খুব সাবধানে থাকতে হয়। এ আমাদের ডি-এইচ আর গাড়ি নয়। তুমি তো বোকার মত সব সময় জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছ। যখনি মানুষ ওঠে নামে নিজের মালপত্রের উপর লক্ষ্য রাখতে হয়। কখন কে কোনটা নিয়ে যায়। সব সময় খুব সচেতন থাকতে হয়। বুদ্ধিমানের মত। এবার বাঙ্কের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকল—ঐ যে লোহার একটা শিকল,

দেখতে পাচ্ছ তো ? গাড়িতে যদি দুর্ঘটনা ঘটে, তখন ঐ শিকল টানতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন থেমে যায়। তবে যদি বিনা কারণে ওটা টেনে গাড়ি থামাও, পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হয়ে যাবে। যখন বাঙ্কে শোবে তখন কিন্তু খেয়াল রেখো, হঠাৎ ওটায় হাত না লাগে, টেনে না ফেল। খুব সাবধান, হ্যাঁ।

আনন্দের আতিশয্যে তুফান একস্প্রেসের গতিতে সে বলে—হ্যাঁ, ওভাবে জানালা দিয়ে মাথা বার করে বসতে নেই, হঠাৎ মাথার উপর জানালা পড়ে যেতে পারে। আবার কখনো পাশের লাইন দিয়ে আসা ট্রেনের কামরার দরজা খোলা থাকতে পারে, তাতেও মাথায় ধাক্কা লাগতে পারে। খুব সাবধান, হ্যাঁ।

বেচারা হরিভক্ত মনের আনন্দে বাইরের দৃশ্যও দেখতে পেল না। রেগে মেগে সে বলল—আমার ঘুম পেয়েছে, শোব। বাঙ্কে উঠে সে শুয়ে পড়ল। কৃষ্ণবীর বলে চলল—হ্যাঁ, ঠিক আছে তাই শোও, কিন্তু পালা করে ঘুমুতে হবে। দুজনেই একসঙ্গে ঘুমুলে যদি কেউ মালপত্র নিয়ে যায় টের পাব না।

হরিভক্ত একবিন্দু ঘুমোল না। সারারাত লোক উঠল, নামল। কিন্তু কৃষ্ণবীর মনের আনন্দে নাক ডাকিয়ে ঘুমোল।

দিল্লী আর দুই চার ঘণ্টার পথ মাত্র। লালকেল্লা ও কুতুব মিনারের স্বপ্নে কৃষ্ণবীর, হরিভক্ত মশগুল। টুনড্‌লা স্টেশনে ট্রেন থামল। কৃষ্ণবীর রেলোয়ে টাইম টেবিল দেখিয়ে বলল--এই দ্যাখ আর দু তিন স্টেশন মাত্র বাকি রয়েছে। দু ঘণ্টা বাদে হয় আমরা বিড়লা মন্দির নয় কনট প্লেস, নয় ইন্‌ডিয়া গেটে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ময়লা গেঞ্জি পাজামা পরা দুজন ছেলে কামরায় উঠল। কৃষ্ণবীর হরিভক্তকে দেখে নিজেরা ফিসফিস করে কি যেন বলল, তারপর একেবারে কোণের দিকে গিয়ে বসল। তাদের দুজনকে দেখিয়ে কৃষ্ণবীর মৃদুকণ্ঠে বলল—হরিভক্ত, এই সব লোক থেকে খুব হুঁশিয়ার, এরা ঠিক গুণ্ডার মত। ট্রেন ছাড়ল। হাতে চামড়ার স্থটকেস নিয়ে একজন লাফিয়ে উঠল কামরায়। স্থটকেস খুলে কাঁচের একটি ডাঁটি ও দুটি শিশি বার করল। এবার বেদেদের মত গলার স্বর করে বলতে থাকল—ভাই সব, মন দিয়ে শুনুন। যদি চোখ দিয়ে জল পড়ে, যদি চোখ লাল হয়, কিংবা চোখে কম দেখেন, তাহলে নিজের প্রিয় দুই চোখে এই অঞ্জন লাগান। চোখকে ভালো করে, সুন্দর করে তোলে। কাঁচের ডাঁটিটি দেখিয়ে বলল—নিন এই সলাই, এটি প্রথমে এই শিশির জলে ধুয়ে নিন এবার দ্বিতীয় শিশিতে পুরে অল্প একটু স্থর্মা বার করে নিজের চোখে লাগান।

লোকটি এগিয়ে গেল। সেই দুটি ছেলের চোখে সুর্মা লাগিয়ে বলতে লাগল—ভাই সব, নিজের প্রিয় চোখ দুটিতে সুর্মা লাগান। পথে চলার সময় চোখে ধুলো পড়ে, ট্রেনে চড়ার সময় ধোঁয়া, কয়লার টুকরো যায়। এই সুর্মা চোখ পরিষ্কার করে, চোখের জ্যোতি বাড়ায়। যদি কোন ভাই সাহেবের প্রয়োজন হয় তো উঠে দাঁড়ান।

স্কুলের হেড্ মাস্টারের চাইতেও ভালো বক্তৃতা শুনে কৃষ্ণবীর মুগ্ধ। আসলে তার মাথায় ঘিলু তো আছে। লেখা পড়ায় মন দেয়নি বলেই তো একই ক্লাসে তিনবার থাকতে হয়েছে। এখন সে কেন পিছিয়ে থাকবে! —আমায় লাগিয়ে দিন, বলে সে উঠে দাঁড়াল।

লোকটি বলল—নিজের প্রিয় চোখে সুর্মা লাগান। এই বলে কাঁচের ডাঁটি ঘসে দিল। হরিভক্ত অবাক চোখে দেখছিল। —আপনিও আপনার প্রিয় চোখ দুটিতে সুর্মা লাগান। হরিভক্ত 'না' বলতে পারে না। চুপ করে বসে রইল। লোকটি প্রায় জোর করে তার দু চোখে সুর্মা লাগিয়ে দিল।

দুজনেই একই সঙ্গে আকাশে দশটি চাঁদ ও সহস্র তারকা দেখতে পেল। একরাশ ধানিলঙ্কার গুঁড়ো যেন চোখে ছিটিয়ে দিয়েছে। জলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। দরদর করে চোখ দিয়ে জল, নাক দিয়ে কফ ঝরছে।

মিনিট পনের পরে একটু স্বস্তি পেল ওরা। এবার মাথা তুলে চারিদিকে তাকাল। তুফান একস্‌প্রেস আপন গতিতে ছুটে চলেছে, কিন্তু কি আশ্চর্য, কামরায় সেই গেঞ্জিপরা ছেলে দুটি নেই, সুর্মাওয়ালা নেই। এদিক ওদিক তাকাল। এবার বাঙ্কের উপর তাকাল। সেখানে রাখা তাদের সুটকেস বেডিংও নেই। কোট, প্যাণ্টের পকেটের মানিব্যাগ সব উধাও।

দুজনে চারদিকে ভালো করে দেখল। কাঁদ কাঁদ স্বরে এবার কৃষ্ণবীর বলল—এতবড় কলকাতার গুণ্ডারা আমাকে কোনদিন ঠকাতে পারেনি আর আজ এই দিল্লীর সুর্মাওয়ালা কত সহজে চোখে ধুলো দিল।

—ধুলো নয়, সুর্মা দিল বল, ফিসফিস করে বলল হরিভক্ত।

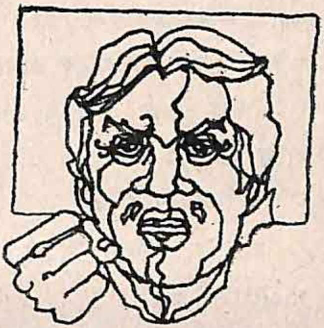
ধপাস করে নিজের জায়গায় বসে দুহাতে মুখ ঢাকল কৃষ্ণবীর। কান্নার আবেগে, অপমানে তার শরীর দুলে দুলে উঠছে।

ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেল। যেন বলছে, সাবধান সরে যাও, আমি আসছি। ট্রেন দিল্লী স্টেশনে ঢুকছে।

জীবন

—দীপলাল রাই

আকাশ যেন শতছিদ্র হয়ে গিয়েছে। আষাঢ় মাসের বর্ষা সবে কিছুক্ষণের জন্যে থেমেছে। বস্তির লতা-পাতা ঢাকা পিছল পথ দিয়ে চলতে চলতে বীরের প্যানট হাঁটু পর্যন্ত ভিজে জবজবে। চড়াইয়ের পথে উঠতে উঠতে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস বইছিল ওর। নাক মুখ দিয়ে আগুনের হলকার মত গরম শ্বাস।



এই ভাবে তাকে আসতে দেখে মুনসী বুড়ো বিস্মিত বিস্ফারিত চোখে প্রশ্ন করল—কোথায় চলেছে থেবা? —না জেঠু গতকাল সন্ধ্যা থেকে আপনার বৌমার ব্যথা উঠেছে। এখনো পর্যন্ত কমছে না। নার্স ডাকার জন্যে কিছু টাকা তো লাগবে। কোন রকমে তাড়াতাড়ি বলল সে।

—না না সেকি! তাড়াতাড়ি নার্স ডাকো। টাকা যা লাগে আমি দেব। বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

শুধু দুজনের এই সংসার। এই জন্যে ও একা ঘরে রুগীকে রেখে হাসপাতাল যাওয়া ঠিক মনে করেনি তাই পাড়ার ছেলে পারঙ্গকে নার্স ডাকতে পাঠালো। তার প্রাণপ্রিয় পত্নী প্রসবযন্ত্রণায় জর্জরিত, তার মনও ব্যথায় কাতর। পারঙ্গ তাড়াতাড়ি দেড় মাইল পাহাড়ি পথ উঠল। হাসপাতালে পৌছল। ডাক্তারবাবু ছুটিতে কলকাতা যাওয়ায় সোজা নার্সের কাছে উপস্থিত হল সে। সবকথা খুলে বলল নার্সকে এবং অনুরোধ করল যাতে তাড়াতাড়ি রুগীর কাছে আসে।

—হ্যাঁ যাব তো নিশ্চই। তবে রুগী দেখতে যাবার ফি পঁচিশ টাকা দিতে হবে। রুক্ষ কঠোর ভাবে বলল নার্স। পারঙ্গ পড়ল বিপদে। সে ভাবল যদি এই কথায় রাজী হয়ে নার্স নিয়ে আসে, তাহলে অত গরীব বীরে এত টাকা দেবে কিভাবে? না নিলেও তো চলবে না। কি যে করা যায়।

—না দিদি, অমন করে বলবেন না। অত টাকা আমাদের মত গরীবরা কিভাবে দিতে পারে? পারঙ্গের কোমল করুণ কণ্ঠস্বরেও নার্সের হৃদয় ভিজল না।

—অমন কথা বোল না ভাই। যদি দিতে না পারো তাহলে চলে যাও। যদি প্রয়োজন মনে কর, আবার নিতে এসো। একথা বলেই নার্স গল্প করতে শুরু করল অন্য একজনের সঙ্গে। পারঙ্গের উপস্থিতির প্রতি তার কোন খেয়াল নেই। হতাশ হয়ে পারঙ্গ আবার ছুটতে ছুটতে বস্তিতে এলো।

বীরের ছোট ঝুপড়িতে প্রসব যন্ত্রণায় কাতর, ওর স্ত্রী ছটফট করছে, মাঝে মাঝে চিৎকার করছে। তার কাতর কান্না হৃদয় বিদারক। এই দৃশ্য সহ্য করতে পারছে না কেউ।

যত টাকা লাগে লাগুক, এই কথা বলে পারঙ্গকে আবার হাসপাতালে পাঠালো বীরে।

আজ পৃথিবী টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না। সব কিছুই টাকার বশ। মানুষের জীবন ও মন টাকার কাছে তুচ্ছ, অর্থহীন।

টাকা পাবে জানতে পেরে এবার নার্স নিজেকে ঠিকঠাক করে যাবার জন্যে তৈরি হল। আগে আগে পারঙ্গ দ্রুত ছুটছে, অথচ নার্স ধীরে সুস্থে হাঁটছে। কোন কিছুতেই তার কিছুই যায় আসে না।

বেলা প্রায় দুটো বাজে। সমস্ত আকাশ মেঘে ঢাকা। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি ঝরছে। বীরের ঝুপড়ির কাছাকাছি অনেকেই রয়েছে। নার্স এসেই রুগীর ঘরে ঢুকল নাড়ি পরীক্ষা করতে। ততক্ষণে রুগীর শরীর শীতল হয়ে গিয়েছে।

যেন কিছুই হয়নি, এমন ভাবে বীরের দিকে তাকিয়ে নার্স বলল—কৈ, রোগী তো নেই।

বীরে মূহূর্ত মাত্র বিস্মিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইল। সমস্ত ভুবন ওর কাছে অন্ধকার হয়ে গেছে। দুই চোখে জল ভরে গেল। কথা বলতে গিয়েও পারল না। গলা বুজে এলো। একটুক্ষণ পরেই তার চোখে মুখে প্রতিশোধের রেখা ফুটে উঠল। প্রচণ্ড ক্রোধে ও চিৎকার করে উঠল—নার্স তুমিই আমার স্ত্রীর হত্যাকারী। তুমি আমার সংসার জ্বালিয়ে দিলে। এবার আমি তোমার সংসার শেষ করে দেব। নার্স তুমি মানুষ নও, ডাইনি। গরীবেরও প্রাণ

আছে, জীবন আছে, বুঝলে। দুহাত বাড়িয়ে নার্সের গলা টিপবার চেষ্টা করল ও।

আকস্মিক ভাবে বীরের দুই দৃঢ় হাতে ধরা গলা ছাড়াবার জন্যে তীরবিদ্ধ পাখির মত ছটফট করতে লাগল নার্স। ওখানে উপস্থিত অনেকে কত চেষ্টা করল ওর বজ্রমুঠি থেকে নার্সকে ছাড়াতে। পারল না। একটুক্ষণ পরে, নার্সের নির্জীব শরীর সেখানে পড়ে গেল। লোকজনের মাঝখানে। তখনো পাগলের মত চিৎকার করে চলেছে বীরে—হাঃ হাঃ হাঃ পঁচিশ টাকা, শুধু পঁচিশ টাকার জন্যে একটা মানুষের মৃত্যু—একটি সংসার ছারখার—মানুষের কি অপমান! একটুক্ষণ পরে করুণ স্বরে বিলাপ করতে থাকে ও—না, না, আমি হত্যাকারী নই, ওই নার্স হচ্ছে হত্যাকারী—হ্যাঁ ঐ নার্স।

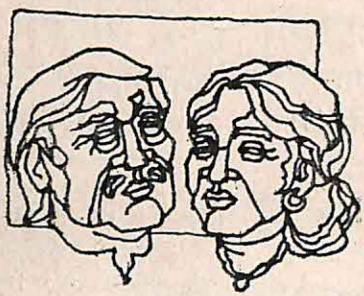
ততক্ষণে সূর্য পশ্চিমে পাহাড়ের অন্তরালে আত্মগোপন করছে।

[দীপলাল রাই : কালিম্পঙ-এর মনসোং অঞ্চলে বরমেক কুইনিন বাগিচায় ১৯৪৩ সালে জন্মগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে মংপুর কুইনিন ফ্যাকটরিতে করনিক। কৈশোর হতেই সাহিত্য-চর্চা করছেন। দার্জিলিঙ জেলার পরিচিত কথাশিল্পী। অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে নীরবে সাহিত্য সাধনা করে চলেছেন।

অন্তহীন

—গোবিন্দ শর্মা

মাথা ব্যথা করছে বলছিলে। তা এখন আবার বই পড়তে শুরু করেছ।



পড়া বন্ধ কর। অত বেশী পড়ার জন্যেই চোখ ব্যথা করে। সারাদিন বসে বসে পড়বে আর সারারাত না ঘুমিয়ে ছটফট করবে। মাথা ব্যথার আর দোষ কি? চোখ এবং মাথা যদি বিশ্রাম পায় তাহলেই সুস্থ হতে পারবে।

স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শুনে সুব্বা তার গীতা পাঠ বন্ধ রেখে কোলের ওপর রাখলেন। এবার আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে মাথা ওপর দিকে ফেরালেন। এমনি এখন তাঁর পড়ায় কোন উৎসাহ ছিল না, কিন্তু হাতে কোন কাজ না থাকায় মিছিমিছি সময় নষ্ট না করে, বারান্দায় বসে জোর করেই বই পড়তে শুরু করেন।

তাঁকে এই ভাবে কেদারায় মাথা হেলিয়ে বসে থাকতে দেখে তাঁর স্ত্রী কাছেই মাটিতে বসলেন। সুব্বা তাঁর দিকে তাকালেন না। তিনি এক দৃষ্টে তখন তাকিয়ে আছেন তাঁর বাড়ির উঠোনের একমাত্র গাছের দিকে। একটি ছোট পাখি, ঐ গাছের কোটরে বাসা বানাতে ব্যস্ত। ঐ পাখির বাসা বানানো দেখেই সময় কেটে যাবে, ভাবলেন তিনি।

নিজের ছোট ছোট পাখা ঝাপটিয়ে ছটফটিয়ে ছোট্ট পাখিটা নানা জায়গা থেকে ছোট ছোট শলা সংগ্রহ করে নিপুণ শিল্পীর মত বাসা তৈরি করে চলেছে। বারবার ওড়াউড়ি করার জন্যে ওর নরম শরীর থেকে দু-একটা পাখনা খসে পড়েছে।

বৃদ্ধ সুব্বা ভাবলেন, এই পাখিটা একটি ছোট সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখছে। এমন একটি সংসার, যেখানে থাকবে ওর মাতৃত্ব ও কর্তব্যবোধ। আর

কিছুদিন পরই ঐ বাসায় ডিম পাড়বে, তা থেকে ছোট ছোট বাচ্চা হবে। এই ছোট পাখি, নানা জায়গা থেকে খাবার সংগ্রহ করে এনে বাচ্চাদের খাওয়াবে।

—আবার চিন্তা করতে শুরু করলে ? কি অত ভাবছ বলোতো ? স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে ধ্যানভঙ্গ হয় চিন্তামগ্ন সুব্বার।

—কিছু তো ভাবছি না। পাখির বাসা তৈরি করা দেখছি। এ কথা বলে আবার সেই গাছের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন সুব্বা। পাখির বাসা তৈরি দেখতে থাকলেন।

—ও, এই ব্যাপার! গাছের দিকে তাকালেন সুব্বার স্ত্রী। একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। এবার সুব্বা তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকালেন। তাঁর স্ত্রী এখন তন্ময় হয়ে পাখির কার্যকলাপ দেখছেন।

—কি ভাবছ ? স্ত্রীর ধ্যানভঙ্গ করার জন্যে বললেন সুব্বা।

—কিছু না তো! নিজের মনোভাব গোপন করার জন্যে বললেন তিনি।

—আমাকে মিথ্যে কথা বলছ ? কি ভাবছ, বলোনা!

—কিছু না! তাঁর দীর্ঘশ্বাস তাঁর মনোভাব বুঝিয়ে দিল। সুব্বার বুঝতে অসুবিধে হল না, তাঁর স্ত্রী কি ভাবছেন।

—কি ভাবছিলে, বলো না। যেন কিছুই জানেন না, বোঝেন নি, এমন ভাবে প্রশ্ন করলেন।

—না ভাবছি, কত উৎসাহভরে পাখিটি তার বাসা বানাচ্ছে। তারপর ওর মধ্যে ডিম পাড়বে। তারপর বাচ্চা হবে। নিজের শিশুদের জন্যে ঝড় জল উপেক্ষা করে দূর-দূরান্ত হতে খাবার জোগাড় করে এনে খাওয়াবে। কিন্তু কেন ? কি জন্যে ?

—হাঁা, কি বলছ ? উদাস প্রশ্ন সুব্বার।

—চিন্তা করে দেখ, এত কষ্ট করার বিনিময়ে পাখিটা কি পাবে। কেন সে এত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করবে ? যতদিন পাখা গজাবে না ততদিন পাখি ওদের দেখাশুনো করবে। পাখা গজালে বাচ্চারাও উড়ে চলে যাবে। পাখি বেচারি আবার সেই একা হয়ে যাবে। তাই না ? দেখো এখন কত কষ্ট করে এই ছোট্ট ঠোঁটে এক-একটা করে শলা এনে ঘর তৈরি করছে। ডিম পাড়ার পর সেই ডিম রক্ষা করা, কোন কাক বা বড় পাখি ডিম খেয়ে ফেলে কিনা সেই চিন্তা, কেউ ডিম ফাটিয়ে দেবে কিনা সেই ভয়—এই সব কিছুর

শেষে একদিন সেই বাচ্চারা নিজের মাকে ছেড়ে স্বাবলম্বী হয়ে, নীল আকাশে উড়ে চলে যাবে। দূরে অনেক দূরে চলে যাবে। তখন সারা জীবনেও আর মায়ের সঙ্গে দেখা হবে না। তাই না কি ?

সুব্বা একথার কোন উত্তর দিলেন না।

—সুশীলের জন্যে আমরাও কি করিনি ? কত কষ্ট করে পড়িয়েছি। বড় করেছি। আর আজ—নিজের কথা শেষ না করেই বৃদ্ধা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। নানা চিন্তায় জর্জরিত।

—যা হবার হয়ে গিয়েছে। এসব নিয়ে আর বেশি চিন্তা কোর না। এভাবে চিন্তা করা ভালো নয়। যা হবার তা কেউ ঠেকাতে পারে না। একটা ছোট পাখি প্রকৃতির নিয়মেই বড় হয়ে ওঠা নিজের বাচ্চাকে উড়ে চলে যেতে দেখে সেই বিয়োগ ব্যথা সহ্যও করে। তুমি আমি তো মানুষ। প্রকৃতির নিয়ম আমাদের মেনে চলা উচিত। মানুষ এখানে যাবার জন্যে আসে, আসার জন্যে যায়। যে আসে সেই তো যায়, এবং যে যায় সেই তো আসে। যে যাবার নয় সে আসে না। যে আসে না, সে যায়ও না। সুব্বা স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু নিজেই চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন। নিজে যে চিন্তা করছেন একথা স্ত্রীকে বুঝতে না দেবার জন্যে গীতা খুলে তার পাতায় চোখ রাখেন।

চোখের সামনে কেন একমাত্র পুত্র সুশীলের চেহারা ভেসে ওঠে। কেন যে ওর মা এমন ভাবে মনে করিয়ে দিল। নাঃ ওর মা নয়, ছোট্ট পাখিটাই মনে করিয়ে দিল।

—নাও, এবার তুমিও ভাবতে বসলে। ভাবছ আমি তোমার ছলনা ধরতে পারব না। মনে হবে বই পড়ছ আসলে তা নয়, তুমি চিন্তা করছ।

—না. না তা নয়। হঠাৎ সুশীলের কথা মনে পড়ে গেল। আজ যদি ও থাকত—

—আচ্ছা ফ্যাসাদ। অতীতের কথা সব যে ভুলে যেতে বলো আমায়।

—হ্যাঁ, ঠিকই তো। কিন্তু কি করব বল, তুমিই তো মনে করিয়ে দিলে। ব্যাপার কি জানো। যে সব কথা ভুলতে বলা হয়, তাই বেশি করে মনে পড়ে। কি করে তুমি বল ? কি করে ভুলি আমাদের বিয়ের সেই দিনটির কথা। যজ্ঞের কাছে আমরা বসেছিলাম। তোমার পরনে ছিল লাল শাড়ি।

আমার বারবার তোমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, তুমিও বারবার বাঁকা চোখে আমায় দেখছিলে। তারপর তোমাকে আমি নিয়ে এলাম। বিয়ের দশ বছর পর্যন্ত আমাদের কোন সন্তান না হওয়ায়, লোকে আমাকে দোষ দিল, তোমাকেও বন্ধ্যা বলতে ছাড়ল না। আমরা কত ব্রত উপবাস, পুজা-পার্বণ করলাম। আমাদের দুজনেরই সন্তান লাভের কি তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। কত ওষুধ পত্র, মন্ত্রতন্ত্র, সাধু সন্ন্যাসীদের পাল্লায় পড়ে কত খরচপত্র করেছি। মনে আছে তোমার ?

অবশেষে বিয়ের দশ বছর পর সুশীলের জন্ম হল। যারা আমাদের কটূক্তি করত তাদের মুখ বন্ধ হল। কত কষ্ট সহ্য করেছ তুমি ওর জন্মের সময়। ওর সামান্য একটু সর্দিকাশি হলেই আমি ডাক্তার ডেকেছি। রাত্রে সুশীল কাঁদবে বলে, আমরা দুজন পালা করে রাত জেগেছি। এখন ভাবি, কি লাভ হল এত কষ্ট করে। তুমিই বল, এসব কথা কি তুমিই ভুলতে পারো ? হারিয়ে যাওয়া দিনের কথা মনে পড়লে কি তোমার চোখে জল আসে না ?

—হ্যাঁ, তা তো ঠিক বলেছ—

—ভেবে দ্যাখো কত কষ্ট সহ্য করে ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছি। তাকে বিদ্বান বুদ্ধিমান করার চেষ্টা করেছি। নিজে ভালো করে না খেয়ে ওর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আমি এই ঘর তৈরি করে দিলাম। ওর জন্যে টাকা জমিয়েছি, একবেলা খেয়ে ওকে পড়িয়েছি, তারপর ওর যখন সময় হল তখন—

—এতে আমাদের করার কি আছে বলো। যা হবার তাতো হবেই, অদৃষ্ট ওকে টেনে নিয়ে গেছে। নইলে অত পড়াশুনো করার পর ও—

—কথাটা ঠিকই। তবু আমরা দুজনে কত কেঁদেছি। ওকে কত বারণ করেছি। সেনাবিভাগে যোগ না দিতে বলেছি। কিন্তু কিছুতেই আমাদের কথা শোনেনি।

এরপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দুজনেরই চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। এই পরিবেশ থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে বৃদ্ধা উঠে পড়লেন।—যাই তোমার জন্যে দুধ নিয়ে আসি। তিনি রান্নাঘরে চলে গেলেন। বৃদ্ধ তেমনি ভাবে ঘাড় নিচু করে গীতা হাতে বসে রইলেন। প্রকৃতির নির্মম সত্য সহ্য করার মত ক্ষমতালাভের জন্যে নিজেকে তৈরি করছিলেন। তাঁর চোখ দুটি অশ্রুসজল।

কত আশা ছিল। ওকে বড় করে তুলব। ধুমধাম করে বিয়ে দেব। এই

সব চিন্তায় তাঁর সময় কেটে যায়। ছেলে যে যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গিয়েছে, এই সরল সত্য কিছুতেই মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন না তিনি। তাঁর কাছে তাঁর পুত্র জীবিত। অমর।

বাইরের উঠোনের গাছের কোটরে পাখিটা বাসা তৈরিতে ব্যস্ত। তার অনাগত শিশুদের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্যে তার চিন্তা। এখন এটাই তার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। তার ছোট ছোট নখ দিয়ে, গাছের ডালে উঠে, নরম ঠোঁটে ধরা শলা দিয়ে ঘর তৈরি করছে। এই দৃশ্য সহ্য করার ক্ষমতা নেই সুব্বার। তাই গীতা হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে গেলেন।

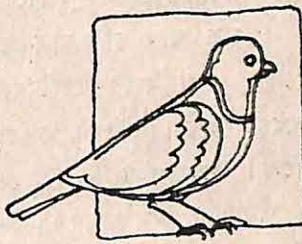
সুব্বার বসে থাকা কেদারাটা, শূন্য অবস্থায়, সেই বারান্দায়, সূর্যের তাপে ক্রমশঃ উত্তপ্ত হতে থাকল।

[গোবিন্দ শর্মা : ১৯৫০ সালে জন্ম। খুব অল্পবয়স হতে সাহিত্যচর্চা করেছেন। শুধু ছোটগল্প নয়, উপন্যাস রচনায়ও দক্ষ। তাঁর অনেকগুলি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বন্ধন, জাল, রিত্তো আকাশ। পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত ছোটগল্পের সংখ্যাও কম নয়। হাস্যরসাত্মক পত্রিকা 'ধোঁয়া' ও 'কুত্‌কুতি' সম্পাদনা করেন। গোবিন্দ শর্মার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব তাঁর ১৯৮০ সালে প্রকাশিত উপন্যাস "লড়না জন্মেকহরু"। বিভিন্ন সৈনিক-দের বাস্তব জীবন হতে তথ্য সংগ্রহ করে উপন্যাসটি লিখেছেন।]

স্মৃতি-বিস্মৃতি

—দাদা রাই

চৈত্র মাসের শেষ। গ্রামের শেষ প্রান্তে একটি ছোট্ট কুঁড়েঘর। এক রবিবারের সকাল। কালু জিজ্ঞেস করল —মা, কোদোরই বীজ আনতে হবে না?



—গতকাল তো সব কাজ সেরে রেখেছি। কাল বাজার থেকে এসে তোকে বললাম, তা তুই তখন শুনলি না। যা-তো কালু, নিচের বাগানে ঘুঘুপাখিরা কি করছে, দ্যাখ। আমি ঘাস কাটতে যাব। মুন্না, তুই ভাত রেঁধে রাখিস। এই বলে আসমায়া দড়ি ও কাস্তে নিয়ে রেলি ঝর্ণার দিকে এগিয়ে গেল।

কালু গুলতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এটাই চাইছিল ও। তার কাজই হচ্ছে পাখি মারা। তাদের বাসা ভেঙ্গে তছনছ করা, অন্যদের বাগান থেকে শস্য, কুমড়োর গুটি ছিঁড়ে ফেলা। এতেই ওর আনন্দ।

এবার ও নিজেদের বাগানে ঢুকল। একটা ঘুঘু মনের আনন্দে নাচছে। কালুকে দেখে ঘুঘু পাখিটি উড়ে গিয়ে চিলাউনে গাছের ডালে বসল। ভুট্টা গাছের আড়ালে দক্ষ শিকারির মত বসে রইল কালু।

ঘুঘুটি আবার উড়ে এলো। মাথা নাড়িয়ে কোদোর বীচি খেতে থাকল। কালু লক্ষ্য রেখে গুলতির রবার কান পর্যন্ত টেনে ছেড়ে দিল। ঝটপট শব্দ হবার পরক্ষণেই ঘুঘুটি ছটফট করতে লাগল। অব্যর্থ লক্ষ্য। আজ পর্যন্ত ছোটখাট পাখি মেরেছে কালু। আজ এই বড় পাখি মারতে পারায় আনন্দে প্রায় আত্মহারা। একদৌড়ে গিয়ে ঘুঘুটি তুলে নিয়ে বাড়ির পথে হাঁটল। দিদি দেখেই বলল ইস্, কেন মারলি? আহা বেচারা। অথচ তার চোখে-মুখে লোভাতুর দৃষ্টি। —তা যখন মেরেছিস এটাই রান্না করা যাক। এই কথা বলে রান্না ঘরের দিকে গেল। কালু গুলতি নাচাতে নাচাতে আবার কোদো ক্ষেতের দিকে গেল।

ঘাসের বোঝা নিয়ে ফিরল আসমায়া। গাইয়ের দুধ বিক্রি করে যা পায়, তাতে সপ্তাহের রেশন তোলা যায়। মাকে আসতে দেখে বলল মুন্না—মা একবার রান্নাঘরে এসো। নিজে উনুনের ধারে গেল। কালুও ফিরে এলো।

তিনজনের জন্যে ভাত বেড়ে মুন্না প্রথমে কালুর থালা এগিয়ে দিল। নিজেরটা কাছে রেখে এবার মায়েরটা এগিয়ে দিল।

—এটা কিসের তরকারি বানিয়েছিস? মা জিজ্ঞেস করে।

—বাগান থেকে ও ঘুঘু মেরে এনেছে, তাই রেঁধেছি।

—হাড় আর ছাল মাত্র রয়েছে। মাংস তেমন নেই। মা ঘুঘু ডিমে তা দিচ্ছে। ঝর্ণার ধারে গুহেলি গাছে ওদের বাসা। যখন ডিম পাড়ে তখনি দেখেছি আমরা। তখন জল ভরতে গিয়ে দেখি। একটা মাত্র ঘুঘু ডিমে তা দিচ্ছে। পুরুষ ঘুঘুটা ও মেরে ফেলল।

আসমায়া অবাক হল। ভাতের থালা দূরে সরিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু বন্যা নামল। রুদ্ধ কণ্ঠে বলল আমি ভাত খাব না। তোরা খা। বলেই উঠে গেল। কালু তার নিজের ভাগ চেটে পুটে খেয়ে নিল। মুন্না সঠিক কিছু বুঝতে না পারায় বিষণ্ণ হয়ে রইল।

আসমায়ার নিজের অতীত দিনের ঘটনাগুলি একের পর এক তার মানসপটে ভেসে উঠল। এমনি এক চৈত্রের দিনের ঘটনা। কালুর জন্মের তিন সপ্তাহ পরের ঘটনা। ঘরে একদানা চাল নেই। জমির এক সামান্য টুকরো মাত্র রয়েছে।

পাশের বাড়ির ঠিকাদার বাবু বীরসিংহের ফুলের বাগানই অতখানি। নিজে আঁতুড়ঘরে। মুন্নার বয়েস চার বছর। তায় রুগ্ন। তার স্বামী বস্তির সকলের কাছে হাত পেতেছে। পায়নি কিছুই। কণ্ট্রোলের দেড় কিলো চালে এক সপ্তাহ চলা কঠিন। তার উপযোগী খাবার পাওয়া স্বপ্ন দেখার সামিল। মুন্নার বাবা জঙ্গলে গিয়েছে। তরুল খুঁড়ে আনবার জন্যে। এখনি ফিরবে, এই আসছে, ভাবতে ভাবতে রাত হয়ে গেল। মুন্না ও তার ভাই কেঁদে কেটে অস্থির। পেটে ভাত নেই। আসমায়ার বুকে দুধ আসবে কি ভাবে? অনেক কষ্টে রাত কাটালো। তাদের বাবা ফিরল না।

সকালে নিচের বস্তির মাইলা থাপা এলো। পদধ্বনি শুনে, মুন্নার বাবা মনে করে একদিকে ক্রোধ অন্যদিকে স্বস্তির ভাব মনে নিয়ে অপেক্ষায় রইল আসমায়া। বাইরে থেকে, দিদি দিদি ডাক শুনে ও বুঝলো মুন্নার বাবা নয়

মাইলা এসেছে। —কি হয়েছে মাইলা ? ভয় জড়ানো গলায় জানতে চাইল আসমায়া। নিজেকে সংযত করে বলল মাইলা।—নিচের বিরাট পাথরের কাটলে গর্ত খুঁড়ে জামাইবাবু তরুল খুঁজছিলেন। পাথর উল্টে যায়। তাতে চাপা পড়েছেন। দারুণ শব্দ শুনে রাখাল ছেলেরা ছুটে যায়। দেখে ঐ অবস্থা। ঘটনা শুনে আমিও গেছিলাম। গিয়ে দেখি ঘটনা সত্যি। তাই খবর দিতে এলাম। নিজে আঁতুড়ঘরে। একদানা খাবার নেই ঘরে। তার উপর স্বামীর এই নিদারুণ সংবাদ। এই অবস্থায় আসমায়া না পারল কাঁদতে, না চিৎকার করতে।

সেই কঠিন অবস্থার পর দশ বছর কেটে গিয়েছে। আজ পুরুষ ঘুঘুর মৃত্যু, স্ত্রী ঘুঘুর ডিমে তা দেওয়ার ঘটনা, নিজের পূর্ব অবস্থা মনে পড়ে যাওয়ায় ক্ষুধা, তৃষ্ণা ভুলে গেল। বিছানায় শুয়ে অবিরল অশ্রু বিসর্জন করতে থাকে।

মুন্না মায়ের ভাত ঢেকে রাখল। বাসনপত্র মেজে মাকে জিজ্ঞেস করতে গেল—মা,তুমি কেন খাবে না ? চোদ্দ বছরের কিশোরীকে সত্য ঘটনা জানানো উচিত মনে করল না আসমায়া। বলল, বললাম যে মাথা ব্যথা করছে। তাই খাইনি। যাও, গাইকে ঘাস জল খেতে দাও। একথা বলে মাথার ওপর কম্বল টেনে দিল।

[দাদা রাই : প্রাথমিক শিক্ষক, দাদা রাই অধিকাংশ সময় সাহিত্যচর্চায় ব্যস্ত থাকেন। শুধুমাত্র ছোট গল্পের প্রতিই এর আগ্রহ। নিরন্তরভাবে লিখে চলেছেন। খ্যাতিও যথেষ্ট। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকেই ঝোঁক বেশি।]

প্রাচীর

—কৃষ্ণভক্ত খঁড়কা

প্রতিদিনের মত আজ সকালেও রামভক্ত উপাধ্যায়কে গীতাপাঠ করতে শোনা গেল। মানুষকে ভক্তির মার্গদর্শন করাতে উনি অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। মোক্ষ কাকে বলে, দিব্য-জ্ঞান কি, কিভাবে যথার্থ ভগবদ্‌ভক্ত হওয়া যায়, এই সব জ্ঞানগর্ভ বাণী প্রচার করে উনি প্রসিদ্ধ হয়েছেন। গ্রামের মান্যগণ্য পুরোহিত, "স্বর্গের টিকিট" কিনতে হলে গ্রামবাসীদের তাঁর শরণ নিতে হয় নজরানা সমেত।



যাহোক তিনি মানুষকে মুক্তিমার্গ দেখিয়ে ও মুক্তির লোভ দেখিয়ে অজ্ঞান, ধর্মভীরু, ধর্মান্ধ ও অশিক্ষিত জনসাধারণকে ঠকিয়ে লক্ষ্মীর বরপুত্র হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁর কোন জিনিসেরই অভাব ছিল না। ধানক্ষেত ছিল, গোয়ালভরা গরু থাকায়, দুধ, দৈ, ঘি যথেষ্ট পেতেন। এ ছাড়াও মূর্খ গ্রামবাসীদের ঠকাবার জন্যে তাদের "মহাজন" হয়ে বন্ধকী কারবার করেন। অথচ সেখানে 'পান' বলে কোন কথা নেই।

উপাধ্যায়ের কুন্তী নামে সর্বগুণান্বিতা এক সুন্দরী মেয়ে ছিল। গৌরবর্ণা, কৃষকায়, সুন্দর গড়ন কুন্তীর, স্বভাব সরল ও কোমল। গ্রামের উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে যৌবন এসে তার শরীরের দ্বারে আঘাত করেছে। তার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যৌবন বাসা বাঁধছে। কিন্তু নিজের শরীরের এই সদ্য যৌবন সম্পর্কে কুন্তী অজ্ঞ ছিল।

রামভক্ত উপাধ্যায় প্রাচীন সভতা ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এবং 'বর্ণসংকরে' বিশ্বাসী। তিনি জাতপাতের উগ্র সমর্থক। উনি প্রচার করতেন—আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান, তবে বাস্তবে আমরা এক ঈশ্বরের, এক পিতার হাজার জাতের সন্তান—একথাটাও জুড়ে দিতেন। জাত পাতের কট্টর সমর্থক পণ্ডিতজির হৃদয়ে ছোটজাতের জন্যে তিলমাত্র স্থান ছিল না। কিন্তু ছোটজাতের

লোকদের দিয়ে কাজকর্ম করাতে কখনো পশ্চাৎপদ্ হতেন না। ছোটজাতের ছোঁওয়া থালাবাসন, ঝকঝক করে মাজা, ঘি মেখে আগুনে না সেঁকলে শুদ্ধ হয় না। কিন্তু সেই ছোটজাতের কর্ষণ করা ক্ষেতে ধান ও ধানরাখার গোলা, ছোটজাতে ছুঁলেও অশুদ্ধ হয় না। কেননা তারা তো রোদে পোড়া জলে ভেজা ছোটজাত মাত্র। তবু মূর্খ, ধর্মভীরু, ধর্মান্ধ জনতা যশের ভাগী হতে পারল না।

** ** **

অন্তরে কুমালে নিজের ছেলে মহেন্দ্রকে স্কুলে ভর্তি করেছিল অনেক আশা নিয়ে। যাতে সে বড় হতে পারে, সমাজের মান্যগণ্য লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে। এর জন্যে তার পেটের খাবারেও টান ধরেছে।

বাবার সেই স্বপ্ন সফল করে মহেন্দ্র বি-এ পাশ করে গ্রামে ফিরে এসেছে। দার্জিলিঙের সুন্দর প্রকৃতি, সুন্দর বাতাবরণ ওকে মুগ্ধ করেছে। যে গ্রামে ও হয়েছে, বড় হয়েছে, সে গ্রাম শান্ত, নিস্তরঙ্গ।

নিজের স্বপ্ন সফল হওয়ায় অন্তরের আর মাটিতে পা পড়ে না। সে এখন আনন্দে ডগমগ হয়ে হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। কোথায় গেল মহেন্দ্র, এখনো দেখছি না কেন মহেন্দ্রকে, এক মুহূর্তও চোখের আড়াল করতে চায় না। ওকে চোখের মণির মধ্যে বন্দী করে রাখতে চায়। দেখতে দেখতে মহেন্দ্রর গল্প রামভক্ত উপাধ্যায়ের কাছেও পৌঁছয়। ওর সাফল্যে সাধুবাদ জানাবার জন্যে মহেন্দ্রকে ডেকে পাঠান তিনি। অন্তরে কুমালে একথা শুনে হতবাক্। আনন্দে অহঙ্কারে বাক্‌রুদ্ধ কণ্ঠে বলে—কাল কিন্তু ঠাকুর মশায়ের বাড়ি যেতে হবে। ডেকে পাঠিয়েছেন।

পরদিন মোরগডাকা ভোরে ঘুম ভাঙ্গে মহেন্দ্রর। পাখির কলকাকলি ওর কানে আসে। তোয়ালে ও সাবান নিয়ে স্নান করার জন্যে চোখে গগল্‌স্ লাগিয়ে ঝর্ণার দিকে এগিয়ে গেল।

গ্রামের এই একমাত্র ঝর্ণা থেকে প্রতিদিন বাবার স্নানের জন্যে জল আনতে যেত কুন্তী। আজও কোমরে কলস নিয়ে মত্ত হরিণীর ছন্দে এগিয়ে চলে কুন্তী বাবার জন্যে জল আনতে।

ঝর্ণায় পৌঁছে কুন্তী কলস রেখে হাত মুখ ধুতে থাকে। একটু দূরে একটা বড় পাথরে বসে মহেন্দ্র স্নান করছে। এ পর্যন্ত কেউ কাউকে দেখেনি। জল

ভরে কুন্তী বাড়ির পথে পা দিল। কিন্তু একটা পিছল পাথরে পা রাখতেই পড়ে গেল। পিতলের কলস শব্দ করে গড়িয়ে গেল। সেই কলসে ধাক্কা খেয়ে আঘাত পেল কুন্তী।

নারীকণ্ঠের করুণ আর্তনাদ শুনে মহেন্দ্র মাথা উঁচু করে দেখল। কাছেই এক যুবতীর মাথা থেকে রক্ত ঝরতে দেখে তোয়ালে নিয়ে দৌড় দিল ওকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে।

নিজের সামনে এক অপরিচিত যুবককে দেখে হতচকিত হয়ে পড়ে কুন্তী। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই মহেন্দ্র তার শাড়ির আঁচল দিয়ে রক্ত মুছে ঝর্নার জল দিয়ে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে দিল। কুন্তী প্রতিবাদ করার কোন সুযোগ পেল না। মহেন্দ্রকে ও চিনতেও পারেনি। মহেন্দ্রর ভরে দেওয়া জল কলসীতে নিয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। মহেন্দ্র নিজের মনে স্নান করতে থাকে।

** ** **

ঘরে পৌঁছে কুন্তী কলসী নামিয়ে রাখল। উনুন থেকে গরম জল নিয়ে কলসীর জল মিশিয়ে ঈষদুষ্ণ করে বাবার স্নানের জন্যে যথাস্থানে রেখে দিল। তারপর ঘরের কাজে মন দিল। তার কোন ধারণাই ছিল না, জল ভরে দেওয়া ঐ পুরুষটি জাতে কুমোর।

ব্রাহ্মণপণ্ডিত গা ডলে ডলে স্নান করলেন। স্নানের পর সেই জল দিয়ে সূর্যার্ঘ্য দিলেন। সবশেষে সেই জল দিয়েই 'গীতাপাঠ' করতে করতে দেবতার উদ্দেশ্যে বারিসিঞ্চন করলেন।

হঠাৎই তিনি দেখলেন কুন্তীর মাথায় আঘাতের চিহ্ন। একটিমাত্র মেয়ে তাই তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। ওকে প্রশ্ন করায় ও আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করল। একথাও সে বলল, একজন অপরিচিত যুবক তার আঘাতের জায়গা মুছে দিয়েছে। অপরিচিত যুবক শোনা মাত্রই মহেন্দ্রর কথা মনে হল রামভক্তর। শঙ্কিতস্বরে জিজ্ঞেস করলেন—কোন অচেনা যুবক?

—একটা কালো চশমাপরা যুবক। ভয় মিশ্রিতস্বরে বলল কুন্তী।

—চশমা পরা ছিল? তার কণ্ঠস্বরে দ্বিধা ও ভয়।

—হাঁা অচেনা এবং চশমাপরা। ভীতকণ্ঠে'সে বলল। —উনি আমার কলসীও ভরে দিলেন। সেই জলই এনেছি আমি।

—ছেলেটা কোন জাতের? রাগে কাঁপতে কাঁপতে জানতে চাইলেন রামভক্ত। —অন্তরে কুমালের ছেলে নয় তো?

—অন্তরে কুমালের ছেলে?

কুন্তীর হৃৎপিণ্ড যেন খাঁচা ছাড়া। ভয়ে সর্বাঙ্গ থরথর কাঁপছে। তবু সাহস সঞ্চয় করে বলল—আমি, আমি তাকে চিনিনা।

সেই সময় ভালো বেশভূষা, স্যুটবুট পরে চোখে চশমা লাগিয়ে সুদর্শন মহেন্দ্র পণ্ডিতজির কাছে এসে হাজির। পেছনে অন্তরে কুমালেও ছিল। মহেন্দ্রকে দেখামাত্র পণ্ডিতজি তাকে ইসারায় দেখিয়ে মৃদুস্বরে জানতে চাইলেন—এই ছেলেটা নয় তো?

—হ্যাঁ, এই। মাথা নেড়ে সায় দিল কুন্তী।

—রাম···রাম···শিব···শিব, তুই আমার আজন্মসঞ্চিত পুণ্য নষ্ট করে দিয়েছিস। পুরোহিত গর্জন করে উঠলেন—কুজাতের ছোঁয়া জলে আমার আজন্মলালিত পুণ্য নষ্ট হল। ওই জল আমি ঈশ্বরকেও উৎসর্গ করেছি। হরে···হরে। কাঁপতে লাগলেন পণ্ডিতজি।

—আজ কি দারুণ অধর্ম হল। তার ওপর কুমোরের ছেলে ব্রাহ্মণ কন্যা স্পর্শ করেছে। এ আর এক মহাপাপ। রাম···রাম···শিব··শিব—গোমূত্র নিয়ে এসো, গো মূত্র। পণ্ডিতজি চিৎকার করে উঠলেন।

প্রথমদিকে মহেন্দ্র তিলমাত্র বুঝতে পারে নি। একটু পরে সব কথা বুঝতে পারল। সেও ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল।

—পণ্ডিতজি, চিৎকার করে সে বলল, ধর্মের প্রচারক হয়ে অধর্মের প্রচার করতে লজ্জা হল না আপনার? পৃথিবীর সকলেই আমরা এক পরমপিতার সন্তান বলে, আপনি দাদা-ভাই-দিদি-বোনের মধ্যে, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের প্রাচীর তুলে দিচ্ছেন। এ কেমন জাত? পণ্ডিতজি আপনারই মত আমরাও 'মানব' হ্যাঁ, আমরাও মানুষ। আপনার মত আমাদের শরীরও পঞ্চভূতেই তৈরি। আমাদের মত ছোট জাতে ছোঁওয়া মাত্র আপনাদের জাত যায়, পুণ্য নষ্ট হয় অথচ গোমূত্র পান করলেই জাতে উঠে যান, পুণ্য ফিরে আসে। মানুষ মানুষকে স্পর্শ করলে জাতের প্রশ্ন আসে, কিন্তু পশুর প্রস্রাবে জাত

ফিরে আসে। সত্যিই পণ্ডিতজি আপনি এতদিন ধর্মের আবরণে ধর্মকে কলঙ্কিত করেছেন মাত্র।

এদিকে গ্রামে রটে গিয়েছে পুরোহিত মহাশয়ের সঙ্গে মহেন্দ্রর প্রচণ্ড ঝগড়া বেধেছে। তামাসা দেখতে সমগ্র গ্রামবাসী পণ্ডিতজির বাড়িতে হাজির হয়েছে। মহেন্দ্র তখনো বলে চলেছে—আজ পর্যন্ত আপনার মত কত ধর্ম প্রচারক ধর্মের আড়ালে কত অজ্ঞান, অশিক্ষিত, ধর্মান্ধ, ধর্মভীরু ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দুর্বল মানুষকে ঠকিয়েছে, ছলনা করেছে। যাদের জন্মে আপনি 'মহাজন' হয়েছেন, তারা অনেকেই ছোটজাত, তাদের দেওয়া টাকা হাতে নিয়ে আপনি অপবিত্র হন না; ছোটজাতের চাষ করা মাটি হতে ধান নিয়ে গোলায় রাখলে গোলা অশুদ্ধ হয় না, ধান অশুদ্ধ হয় না—আর আজ আমার ছোঁওয়া জলে ভগবান পর্যন্ত অশুদ্ধ হয়েছেন, আপনার মেয়েও অশুদ্ধ হয়েছেন? পণ্ডিতজি, আজকের সমাজে জাতি ও বর্ণের প্রাচীর নেই, আমরা সকলেই ঈশ্বরের একই সন্তান ও একই জাতি। আজকের দিনে আমাদের জ্ঞানের আলোক দেখিয়ে ঘুমন্ত মানবাত্মাকে জাগাবার সময় হয়েছে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশ মাতৃকাকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আজো আপনি ঈশ্বরের পুত্রকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখতে চান? মনে রাখবেন পণ্ডিতজি যেভাবে ধনী ও দরিদ্রের প্রচেষ্টায় দেশের অগ্রগতি হয় সেইভাবে জাত ও বর্ণের প্রাচীর দেশের অবনতির সহায়ক। আমরা সমগ্র বিশ্বের মানুষ একই পরম পিতা পরমেশ্বরের সন্তান। এই কারণে বিশ্বের মানব সমাজের প্রাণী একই জাতের দাদা-ভাই, সেই ভাবে আমরা ধরিত্রী-মাতার প্রসাদ গ্রহণ করে পৃথিবীর সৃষ্টি ও প্রলয়ের অংশীদার হব, তাই আমরা সবাই একই বর্ণের। আমাদের মধ্যে বিভেদ নেই, শুধু আমাদের ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের পথমাত্র আলাদা দেখা যায়। মূল পথ 'মানবতা' একই।

অবাক বিস্ময়ে সকলে মহেন্দ্রের বক্তব্য শুনছিল। মহেন্দ্রের কথার প্রভাব পড়ছিল তাদের মধ্যে। এমনকি রামভক্ত উপাধ্যায়ও মনে মনে মহেন্দ্রের বক্তব্য সমর্থন করলেন।

* * *

আজ সেই গ্রামের নবীকরণ হয়েছে। গ্রামে একটি পাঠশালা স্থাপিত

হয়েছে। পাঠশালা গঠনে যে যেমন পারে সেই ভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বয়স্কদের জন্যে 'প্রৌঢ় শিক্ষাকেন্দ্র' স্থাপিত হয়েছে। রাত্রে প্রৌঢ়রা পড়াশোনা করেন। পণ্ডিতজি একটি রেডিও উপহার দিয়েছেন। সেই রেডিও মারফৎ গ্রাম্য জনসাধারণ বিশ্বকে জানার সুযোগ পেয়েছে। রেডিও প্রচারিত 'গ্রাম্য কার্যক্রম' ও 'জ্ঞান-বিজ্ঞান-স্বাস্থ্য' নামক বিভাগের সাহায্য পেয়ে কৃষি উন্নয়ন, অধিক ফসল উপার্জন ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করায় গ্রামীণ মানুষের উপকার হচ্ছে। গ্রামে একটি ছোট পঞ্চায়েৎ কার্যালয় খোলা হয়েছে। ছোটখাট ব্যাপারে সকলে মিলে সেখানে সমস্যার সমাধান করে ফেলে। বড় বড় ঘটনা অঞ্চল পঞ্চায়েতে জানানো হয়। ছোট পঞ্চায়েৎ-ঘরে দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকা আসে।

ওদের জ্ঞানবর্ধনের জন্যে মাসে এক বা দুইবার ডকুমেণ্টারি ফিল্মের প্রদর্শনী ব্যবস্থা হল। এর দ্বারা গ্রামবাসীরা প্রত্যক্ষ ভাবে জ্ঞান বাড়াবার সুযোগ পেল।

জাতি ও বর্ণের কট্টর সমর্থক রামভক্ত উপাধ্যায় পর্যন্ত জাত বর্ণ কুসংস্কারের প্রাচীর ভেঙ্গে নিজের শ্রমের উপার্জনে গোলা ভরতে থাকেন। তিনি মর্মে-মর্মে অনুভব করলেন মানুষ সকলেই পরস্পরের ভাই।

আজ পণ্ডিতজি বলেন—ওঠ ওঠ হে দেশবাসী, ঐ ধর্মের অহঙ্কার ও জাতি-বর্ণের বিভেদ ভেঙ্গে ফেল, সকলে মিলে গ্রাম, শহর ও দেশকে নতুনভাবে তৈরি কর।

[কৃষ্ণভক্ত বঁড়কা—জলপাইগুড়ির গাচদ্রা পাড়া চা বাগানে জন্ম। 'হাম্রো ধ্বনি' পত্রিকার সহসম্পাদক ও প্রকাশক। প্রথম রচনা 'পর্থাল' উদয়ে প্রকাশিত। অল ইনডিয়া রেডিও হতে এঁর বিভিন্ন নাটক প্রচারিত হয়েছে। বর্তমানে ডুয়ার্সের বাজার হাটের অধিবাসী। নতুন চিন্তাধারার সম্প্রচারক।]

মন্দা

—শ্রীমতী মায়াদেবী ম্রোনজন

মানুষের জীবনে মাঝে মাঝেই ঝড় বয়ে যায়। ঝড়ের দাপটে মানুষের জীবন এক এক খাতে বইতে থাকে। এমনি ঝড়ের দাপটে মন্দার জীবনের



প্রথম মিলন তিথির চাঁদনি রাত কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ল। বসন্ত ঋতুতেই যেন ফোটা ফুলের বাগান শুকিয়ে গেল। তার স্বামীর মৃত্যুতে সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ-দেওরের চোখের বালি হয়ে উঠল সে। কেউ বা বলল ও অলক্ষী। মন্দা সত্যি অভাগিনী বলে প্রমাণিত হল, কারণ মাত্র পনের দিনের ব্যবধানে তার মা ও বাবার মৃত্যু হল। কপাল যদি মন্দ থাকে কারো কিছু করার নেই। কেঁদে, চিৎকার করে, চোখের জল ফেলে কতদিন আর কাটানো যায়। চুপ করে সহ্য করলেই সংসারে সুখ পাওয়া যায়। তাই একমাত্র শান্তি-লাভের পথ।

মন্দা ছিল মা-বাবার একমাত্র আদরের সন্তান। দুঃখ কাকে বলে কোনদিন জানতে পারেনি। অথচ আজ তারই জীবনে একের পর এক অভিশাপ নেমে এল। শ্বশুর বাড়িতে তার ঠাঁই হল না। বেশ কদিন ধরে সে চোখের জল ফেলল।

এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরই তার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জগৎবাবু তাকে দুঃখ-সাগর হতে উদ্ধার করলেন। জগৎবাবুর বাড়িতে তিনি ও তার একমাত্র পুত্র কেশবপ্রসাদ থাকত। সম্প্রতি ওকালতি পাশ করে কেশব আইনব্যবসায় শুরু করেছে। খুব কর্তব্যপরায়ণ যুবক কেশব। নারী জাতিকে সে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত ছিল।

মন্দার খবর শুনে কেশব মনে মনে খুব দুঃখ পেয়েছিল। তাই মন্দার প্রতি তার অপার সহানুভূতি ও স্নেহ ছিল। সে মন্দাকে সুখী করতে চায় তাই তার

সুখী সমৃদ্ধ জীবন দেখতে চায়। ওর সঙ্গে কথা বলে, নানা বিষয় আলোচনা করে মন্দার দুঃখ ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করত। কিন্তু মন্দার মনে এক তিল শান্তি নেই। মলিন মুখে সে দিন কাটাতো। তাকে সবসময় বোঝাত কেশব। মন্দার সমাজভীতি ছিল প্রচণ্ড, তাই অপবাদ থেকে দূরে থাকতে চাইত। মন্দা প্রকৃত সুন্দরী ছিল, তাই সাধারণ বেশ-ভূষাতেই তাকে সুন্দর দেখাত।

মন্দা কেশবের সঙ্গে কম কথা বলত। কখনো ওর চোখে চোখ পড়লে মুখ নামিয়ে নিত। লজ্জা পেত। মন্দার নির্মল চরিত্র ও সলাজ ভঙ্গির জন্যে কেশবের মনে ঝড় বইতে শুরু করল। কিন্তু কেশবও যথেষ্ট বিচারশীল লোক ছিল। মন্দার প্রতি তার প্রবল আকর্ষণ বন্ধ করার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করল সে। কিন্তু তার আন্তরিক প্রেমের দহন দিনের পর দিন বেড়েই চলল। চট করে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে না পারলেও একদিন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল।

কেশব মন্দার কাছে গিয়ে আবেগে—উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বলল —আজ কদিন ধরে মনে মনে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছি। আমার মনের ভার লাঘব করার ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু পারিনি। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রেখেছি। তোমার এই সুন্দর সুগঠিত শরীর এই ভাবে অনাদরে অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এ আমি দেখে সহ্য করতে পারছি না। ঈশ্বর তোমায় রূপ ও গুণ দিয়েছেন। তোমার কোন কিছুর অভাব নেই। কিন্তু আজ পর্যন্ত তোমায় কখনো প্রসন্ন হতে দেখিনি। পৃথিবীতে মানুষকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়। মানব-জীবনই দুঃখপূর্ণ। দৈবের যষ্ঠীর আঘাত সহ্য করতেই হবে। তোমার স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে তোমার ভাগ্যের তরণী ডুবে গিয়েছে এবং সমাজও তোমার মাথায় সব দোষ চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মন্দা, আমি সত্যি কথা বলছি সমাজ অন্ধ। পুরুষ মানুষ স্ত্রীর মৃত্যুর পর একমাস পার না হতেই আবার বিয়ে করে কিন্তু স্ত্রীলোক বিধবা হলে তার ওপর সমাজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়ে এবং তার ঘাড়ে নানারকম দোষ চাপানো হয়। সমাজের এই ঘৃণ্য কাজই দিনের পর দিন নারীজাতিকে অবনতির অতল গহ্বরে টেনে নামাচ্ছে। সমাজের ক্রূর দৃষ্টির রোষানলে পড়ে আমাদের সমাজের কত নারী নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তোমার সুন্দর মুখের ওপর হতে বিষাদের ছাপ মুছে দিয়ে আবার প্রসন্ন ভাব দেখতে চাই। তোমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রতিষ্ঠিত করে সমাজকে নতুন শিক্ষা ও নতুন পথ দেখাতে চাই।

মন্দার দুচোখ দিয়ে অবিরল জলের ধারা বইতে থাকে। যত সে অশ্রু-রোধের চেষ্টা করে তত বেশি জল ঝরতে থাকে।

কেশব নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। সে মন্দার দুটি হাত নিজের হাতে নিয়ে বলল—মন্দা তোমার এই কোমল হাতে ছোট গোলাকার চুড়ি ও শ্বেতবস্ত্রের বদলে রঙিন কাপড় আবার দেখতে চাই। তোমার বিষাদ মলিন মুখে হাসির ছটা দেখতে চাই। তোমার প্রশস্ত ললাটে সিঁদুরের গোল টিপ দেখতে চাই। মন্দা একবার মাত্র কথা বল, তোমার মনের কথা আমায় বল।

মন্দা নিজেকে কিছুটা সামলিয়ে নিয়ে শুষ্ক স্বরে বলল—কেশব দাদা, আমায় ক্ষমা কর।

কেশবের আশার দড়ি ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। তবুও সে আর একবার চেষ্টা করে বলল—মন্দা, অনেকদিন থেকেই আমি তোমাকে আমার হৃদয়ে স্থান দিয়ে ফেলেছি। এখন এই হৃদয়ে তুমি ছাড়া আর কেউ ঠাঁই করে নিতে পারবে না। আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চয় তোমার সন্দেহ হতে পারে। কিন্তু মন্দা আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমার জন্যে যে কোন দুঃখ আমি সহ্য করে নিতে রাজি আছি।

কেশবের আবেগে, আগ্রহে মন্দার মনে ঝড় বইতে থাকে। কথা বলার চেষ্টা করল মন্দা, কিন্তু সব চিন্তা একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে গিয়ে জট পাকিয়ে গেল তাই কিছুই বলতে পারল না। শুধু অনেক কষ্টে বলল—দাদা আমায় ক্ষমা কর।

এই ঘটনার পর মন্দা বেশিক্ষণ নিজের ঘরেই বন্দী হয়ে থাকতে লাগল। দুজনের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয় না। কথাবার্তাও নয়।

এইভাবে একসপ্তাহ কেটে গেল। দুজনের মনের মধ্যেই ঝড় বইতে থাকে। একদিন সন্ধ্যায় কেশব মন্দার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। তার খেয়াল ছিল না কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে মন্দার ঘরের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। বাইরের জানালা থেকে আসা আলোয় দেখতে পেল, মন্দা উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদছে। ঘরের মধ্যে অন্ধকার।

আস্তে করে সুইচ টিপল ও। ঘর আলোয় ভরে গেল। ওর কাছে গিয়ে বলল—মন্দা, কাঁদছ কেন?

মন্দা একই ভাবে কেঁদে চলল।

—মনে অনেক দুঃখ নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। কেঁদো না রাণী।

—আমি আপনাদের আশ্রিত, আপনার বাবা আমারো বাবা, এবং আপনি আমার দাদা। আমার মনে আপনার জন্তে ছোট বোনের যেমন ভালবাসা ও মমতা থাকা উচিত তাই মাত্র আছে। কাঁদতে কাঁদতেই বলল মন্দা।

—মনে রেখ মন্দা, এর শোধ একদিন নেব। রাগ করে বেরিয়ে গেল কেশব।

রাতভোর কেঁদে কাটাল মন্দা। পরদিন সকালে ওর দারুণ জ্বর এল। চিন্তায় ওর শরীর দুর্বল হয়ে গেল। মানসিক পীড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক যন্ত্রণাও শুরু হল। বিছানা নিল মন্দা।

সেদিন থেকে কেশব বেশির ভাগই বাইরে কাটাতে থাকল। শুধু রাত্রে শোবার জন্তে ঘরে আসত। জগৎবাবুই মন্দার সেবাযত্ন শুরু করেন। কেশবের এক বন্ধু ছিল, ডাক্তার জীবন। সেই মন্দার চিকিৎসা শুরু করে।

কিছুদিন পর মন্দার অবস্থার পরিবর্তন হল। সে উঠে বসতে পারল।

জগৎবাবু খুব খুশি হয়ে জীবন ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিলেন। এই অল্প-দিনের মধ্যেই জীবন মন্দার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করল। এখন আর তার আসবার দরকার নেই, তবু দুদিন, তিনদিন পর পর সে আসতে থাকে।

একদিন কেশবের বাবা জগৎবাবুকে কার্যোপলক্ষে বাইরে যেতে হল। যাবার আগে জীবনকে বললেন—মন্দার দেখাশুনো কোরো। এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি। জীবন সম্মত হল।

তারপর হতে জীবন প্রতিদিন আসতে শুরু করে। একদিন কেশবকে বাড়িতে থাকতে দেখে অবাক হয়। এর আগে যখন মন্দার চিকিৎসার জন্তে আসত তখন ওর দেখা পায়নি। কেশবের পাশের চেয়ারে বসে বলল—কি ব্যাপার কেশব, আজ তুমি যে বড় বাড়িতে রয়েছ?

কেশব আপনমনে বই পড়ছিল। হঠাৎ বন্ধু জীবনের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল।

—হ্যালো জীবন, আজ তুমি কোথা থেকে?

অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলল।

—মন্দাকে দেখতে আমি রোজই আসি। তুমিই বরঞ্চ ঘরে থাকো না। আজ কেমন আছে? সহজ স্বরে বলল জীবন।

—হয়ত ভালোই আছে। এসো, গ্যাখো। আমি কি ডাক্তার যে দেখব ?

জীবন এবার চেয়ার থেকে উঠে মন্দার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থেকে কেশব আবার বইয়ের পাতায় মন দিল।

আজকাল জীবন কেশবদের বাড়িতে রোজই আসে। এক দুই ঘণ্টা এই বাড়িতে কাটায়। জীবনকে এইভাবে প্রতিদিন আসতে দেখে কেশবের মনে চিন্তা জাগে।

একদিন জীবন বাইরে কাউকে দেখতে না পেয়ে সোজাসুজি মন্দার ঘরে ঢুকে গেল। কেশব উল্টোদিকের ঘর থেকে জীবনকে লক্ষ্য করছিল আত্মগোপন করে। জীবন মন্দার ঘরে ঢোকার পর সন্তর্পণে বেরিয়ে এল কেশব। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে ওদের কথা শুনতে থাকল।

জীবন তখন বলে চলেছে—চল, কালই আমরা পালিয়ে যাই। একদিন দেরি করলে নানা বাধা আসতে পারে। কতদিন আর আমি তোমার কাছে যাতায়াত করব? মানুষের মুখ বন্ধ করা যায় না। এখন তো তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছ। আমি কোন অজুহাতে তোমায় দেখতে আসব?

ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল মন্দা—এদের মহত্বের বদলে আমি ধোঁকা দিতে চাই না। কেশবদাদা অত্যন্ত উদার হৃদয়ের মানুষ। ওঁকে বললে আমাদের ইচ্ছা পূরণ হবে। ওর বিচার অত্যন্ত উঁচু। আমার সুখের জন্যেই উনি আমায় বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এমন অনর্থ হতে দেবার ইচ্ছে আমার নেই। এই জন্যে উনি আমার ওপর রাগ করে আছেন।

—মন্দা, তুমি একদিকে বলছ কেশব তোমার ওপর রাগ করে আছে আবার বলছ ও তোমাকেই চায়। ও কখনো আমাদের মিলনে রাজি হবে না।

—জীবন, তুমি কেশবদাদাকে চিনতে পারোনি। আমি বলছি একদিন তার সঠিক পরিচয় তুমি পাবে।

মন্দার কথা শুনে কেশব তার হৃদয়ের যথার্থ পরিচয় জানতে পারল। নিজের প্রতি তার ঘৃণার ভাব জাগল। তার মনে অনুতাপ এল। ওদের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে কেশব বলল—মন্দা, আজ তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ। আমি পাপী, আমায় ক্ষমা কর। বাবা ফিরে আসার পরই তোমাদের বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব। তাহলেই তোমার প্রতি আমার কর্তব্য পূরণ হবে, সঙ্গে সঙ্গে আমার অপরাধী মনেরও প্রায়শ্চিত্ত হবে।

মন্দা ও জীবন বিশ্বাস করতে পারল না, কেশব তাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

—মন্দা, তুমি আমার ছোট বোন, আমি তোমার দাদা। আমার অপরাধ ক্ষমা কর তুমি। উন্মত্তের মত বলতে থাকল কেশব।

মন্দা ও জীবন মাথা নিচু করে প্রণাম করল কেশবকে। অশ্রু পূর্ণ চোখে মন্দা বলল—কেশবদাদা, আমি আশা করেছিলাম, একদিন না একদিন তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। এই জীবনে আমার আর সধবা হবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু তোমার নতুন শিক্ষার গুণেই আমার মত বদল হল এবং আমি তোমার নির্দেশই মেনে নিচ্ছি।

একদৃষ্টে কেশব মন্দা ও জীবনের দিকে তাকিয়ে রইল। ওরা ধীরে ধীরে ঘর থেকে বাইরে এল।

হয়ত ওদের মিলনের বার্তা বহন করেই দূরের মন্দিরে তখন আরতির ঘণ্টা বেজে উঠল।

[শ্রীমতী মায়াদেবী য়োনজন—১৯৩১ সালের ২৫শে অক্টোবর দার্জিলিঙ জেলার কালিম্পঙে জন্ম। ১৯৪৭ সালে কালিম্পঙ গার্লস্ স্কুল হতে ম্যাট্রিক পাশ করেন। শৈশব হতেই সাহিত্য-প্রীতি ছিল। 'গোর্খা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'স্বতন্ত্র জীবন'। জাগৃতির নিয়মিত লেখিকা। বর্তমানে নবজাগৃতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। ডুয়ার্সের ঢুমসিপাড়া চা বাগানে থাকেন। ডুয়ার্সের মহিলা লেখিকাদের প্রথপ্রদর্শিকা ও সাহিত্য অনুরাগীদের প্রেরণাদাত্রী।]